وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম পালন করল, সে যেন পূর্ণ এক বছর ছিয়াম পালন করল’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● মে ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، رمضان و شوال ١٤٤٣ هـ / مايو ٢٠٢٢م العدد: ٧، الجزء: ٦٧
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

হুব্বুল ওয়াতান মসজিদ, ইন্দোনেশিয়া : পশ্চিম নুসা টেঙ্গারা প্রদেশের মাতারাম শহরে অবস্থিত মসজিদটি ২০১৩ সালে উদ্বোধন করা হয়। ৭৪ বর্গমিটার আয়তনের মসজিদটিতে একসাথে ১৫০০০ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদটিতে ৫টি উঁচু মিনার ও একটি বড় গম্বুজ রয়েছে। মসজিদ লাগোয়া একটি মিলনায়তন, একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও একটি খেলার মাঠ রয়েছে। নান্দনিক স্থাপত্যশৈলির জন্য মসজিদটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬ষ্ঠ সুন্দরতম মসজিদ হিসেবে পরিচিত।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৩ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ মে	২৯ রামাযান	রবি	০৪:০৩	০৫:২৪	১১:৫৫	০৩:২১	০৬:২৭	০৭:৪৭
০৫ ,,	০৩ শাওয়াল	বৃহস্পতি	০৪:০০	০৫:২১	১১:৫৫	০৩:২০	০৬:২৯	০৭:৫০
১০ ,,	০৮ ,,	মঙ্গল	০৩:৫৬	০৫:১৮	১১:৫৫	০৩:১৯	০৬:৩২	০৭:৫৪
১৫ ,,	১৩ ,,	রবি	০৩:৫২	০৫:১৫	১১:৫৫	০৩:১৮	০৬:৩৪	০৭:৫৭
২০ ,,	১৮ ,,	শুক্র	০৩:৪৯	০৫:১৩	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৬	০৮:০০
২৫ ,,	২৩ ,,	বুধ	০৩:৪৭	০৫:১২	১১:৫৫	০৩:১৭	০৬:৩৯	০৮:০৪

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	-১	০
নারায়ণগঞ্জ	+১	০	০
নরসিংদী	-১	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-৩	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৫	+৩	+১
মাদারীপুর	+৩	+১	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২
শরিয়তপুর	+২	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-২	+২
শেরপুর	-১	-১	+৪
জামালপুর	০	০	+৪
নেত্রকোনা	-৩	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৪	-৭
কক্সবাজার	-২	-৬	-৮
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৬
রাঙ্গামাটি	-৪	-৬	-৮
বান্দরবান	-৩	-৬	-৯
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩
নোয়াখালী	০	-২	-৪
লক্ষীপুর	+৩	-২	-৪
চাঁদপুর	+১	০	-৩
ফেনী	-২	-৩	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৮	-৪
সুনামগঞ্জ	-৬	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৬	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১০
নাটোর	+৫	+৪	+৭
পাবনা	+৩	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৪
বগুড়া	+২	+২	+৬
নওগাঁ	+৪	+৪	+৮
জয়পুরহাট	+৩	+৩	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+১	+১	+৮
দিনাজপুর	+৩	+৪	+১০
গাইবান্ধা	+১	+১	+৬
কুড়িগ্রাম	-১	০	+৬
লালমনিরহাট	০	০	+৭
নীলফামারী	+২	+২	+১০
পঞ্চগড়	+২	+৩	+১২
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৪	+১২

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৬	+৫	+২
বাগেরহাট	+৫	+৪	+১
সাতক্ষীরা	+৮	+৭	+৪
যশোর	+৭	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৪	+৪
নড়াইল	+৫	+৪	+৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৩	+২	-১
পটুয়াখালী	+৪	+২	-২
পিরোজপুর	+৫	+৩	০
ঝালকাঠি	+৪	+২	-১
ভোলা	+২	০	-২
বরগুনা	+৫	+৩	-২

৬ষ্ঠ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
মে-২০২২
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
রামাযান-শাওয়াল
১৪৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ **প্রধান সম্পাদক,**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ**

» আরবী ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ০৩
- ড. মো. কামরুজ্জামান

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-৬ষ্ঠ পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১৩তম পর্ব) ০৬
- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» হক্বের মানদণ্ড (পর্ব-৫) ১০
- মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহিমাহুল্লাহ)
- অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ ১২
- মূল : আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ)
- অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন

» ঈদ উৎসব ১৫
- মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

» ছাদাক্বাতুল ফিত্বর : একটি পর্যালোচনা ১৬
- মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন

» ঈদের মাসায়েল ১৯
- আল-ইতিছাম ডেস্ক

» শাওয়ালের ছিয়াম ও অন্যান্য নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ২২
- অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

◈ **হারামাইনের মিম্বার থেকে**

» মুসলিম উম্মাহর ওপর কুরআনুল কারীমের গুরুত্ব ২৫
- অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী

◈ **তরুণ প্রতিভা**

» যেমন ছিল নবীজীর চরিত্র ২৭
- তাওহীদুর রহমান ইবনু মঈনুল হক্ব

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**

» রাশিয়-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা ৩০
- আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ও টিসিবির লাইনে ধাক্কাধাক্কি ৩৩
- জুয়েল রানা

◈ **দিশারী**

» রামাযান শেষে ৩৬
- জাবির হোসেন

◈ **শিক্ষার্থীদের পাতা**

» মনীষী পরিচিতি-৩ : আল্লামা উবায়দুল্লাহ খান আফীফ (রহিমাহুল্লাহ) ৩৮
- আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ **কবিতা** ৪০

◈ **সংবাদ** ৪১

◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

রামাযানের ভালো কাজের ধারা অব্যাহত রাখুন!

দেখতে দেখতেই বিদায় নিল নানামুখী নেকী কামাই ও প্রশিক্ষণের মাস রামাযান মুবারক। কিন্তু প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে বের হয়ে সৈনিক কি বসে থাকবে? অবশ্যই না। বরং প্রশিক্ষণের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাবে। অন্যথা প্রশিক্ষণ বিফলে যাবে। রামাযানের দ্রুত বিদায় আমাদের দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের বার্তা দিয়ে গেছে। রামাযানের মতো আমাদেরও দুনিয়া থেকে দ্রুত বিদায় নিতে হবে। সুতরাং এ স্বল্প সময়ের জীবনে মোটেও সময় নষ্ট না করে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাছাড়া ইসলাম কেবল অনুষ্ঠান ও মৌসূম সর্বস্ব কোনো জীবনব্যবস্থা নয়; বরং ইসলামে আমরণ আল্লাহর ইবাদত করে যেতে হয় *(আল-হিজর, ১৫/৯৯)*। পরিমাণে অল্প হলেও নিয়মিত ও অব্যাহত আমল মহান আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় *(বুখারী, হা/৬৪৬৪)*। রামাযানের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে তাক্বওয়া অবলম্বন, যা একজন মুমিনকে চিরসঙ্গী করে থাকতে হয়। ঈমানসহ ছওয়াবের আশায় মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই তাক্বওয়ার গোড়ার কথা, যা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। সুতরাং তা শুধু রামাযানের খাঁচায় বন্দী করা চলে কী করে!

মাহে রামাযানে মসজিদগুলো মুছল্লীর পদভারে মুখরিত ছিলো, যা হওয়া উচিত ছিল প্রতিটি মুসলিম সমাজের প্রতিদিন পাঁচবারের চিত্র। কিন্তু রামাযানের বিদায়ের সাথে সাথে মসজিদগুলো মুছল্লীশূন্যতায় হাহাকার করতে শুরু করেছে। মুছল্লীরা মসজিদ ও ছালাতকে গুডবাই জানিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ ছালাত বিনা একজন মানুষ মুসলিম থাকতে পারে না *(আর-রূম, ৩০/৩১; মুসলিম, হা/৮২; ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ২/২৮৪)*। বরং ছালাত ত্যাগকারীর ছিয়ামসহ অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই *(দ্র. ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমাহ, ১০/১৪০)*। অতএব, ছালাত চালিয়ে যাওয়া বা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকেই।

মাহে রামাযানের ফরয ছিয়াম বিদায় নিলেও অন্যান্য ছিয়াম কিন্তু বিদায় নেয়নি। শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম *(তিরমিযী, হা/৭৫৯)*, শা'বানের ছিয়াম *(বুখারী, হা/১৯৭০)*, প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম *(তিরমিযী, হা/৭৪৫)*, প্রতি মাসে 'আইয়্যামে বীয'-এর ৩টি ছিয়াম *(তিরমিযী, হা/৭৬১)*, আশূরায়ে মুহাররমের ছিয়াম *(মুসলিম, হা/১১৬২)*, আরাফার ছিয়াম *(তিরমিযী, হা/৭৪৯)*, ছওমে দাউদ আলাইহিস সালাম *(বুখারী, হা/১৯৭৯)*, সাধারণ নফল ছিয়াম *(বুখারী, হা/২৮৪০)* সহ যত সুন্নাত ছিয়ামের নির্দেশনা শরীআতে আছে, সেগুলো পালন করে আমাদেরকে সারা বছর ছিয়ামের শিক্ষা ধরে রাখতে হবে।

কুরআন তেলাওয়াত ও শ্রবণ, ক্বিয়ামুল লায়ল, দান-ছাদাক্বা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, সদাচরণ, নেশাদার দ্রব্য বর্জন, গান-বাজনা বর্জন, দাওয়াতী কার্যক্রম, অন্নহীনে অন্নদান, অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি যেসব ভালোকাজের অভ্যাস আমাদের রামাযানে গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর ধারা জারি রাখতে হবে। রামাযান চলে গেলেও এগুলো কিন্তু বিদায় নেয়নি; বরং সারা বছর এগুলো করার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

যারা রামাযানের বিদায়ের সাথে সাথে এসব ইবাদত-বন্দেগী ও ভালো কাজকে বিদায় জানায়, তারা মোটেও ভালো মানুষ হতে পারে না। সালাফে ছালেহীনের কেউ কেউ বলেছেন, 'নিকৃষ্ট ক্বওম তারাই, যারা রামাযানের বাইরে অন্য মাসে আল্লাহকে চিনে না' *(লাত্বাইফুল মাআরেফ, পৃ. ২২২)*। বরং এ আচরণ মহান আল্লাহর সাথে ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। আরেকটি বিষয় হলো, আমরা আসলে কার ইবাদত করি? রামাযানের নাকি রামাযানের রবের? যদি রামাযানের রবের ইবাদত করে থাকি, তাহলে তিনি কিন্তু অন্যান্য মাসেরও রব। সুতরাং সারা বছর মহান রবের ইবাদতের বিকল্প নেই। আমরা কি অক্ষমতার খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যাব? অবশ্যই না। আসলে রামাযানে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে আমল করার যোগ্যতা ও সক্ষমতা রয়েছে। তা না হলে গত এক মাস পারলাম কী করে?

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। আমীন!

আরবী ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা ৭ হাজারের অধিক। তার মধ্যে অধিকাংশ মানুষ ২৩টি প্রধান ভাষায় কথা বলে। চীনা ভাষার অবস্থান পৃথিবীতে প্রথম। পৃথিবীতে এ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ১২৮ কোটির উপরে। চীনা ভাষা শুধু গণচীন, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রভাষা। এ ভাষাতে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের মানুষ কথা বলে। দুই নম্বরে অবস্থান করছে স্পেনীয় ভাষা। পৃথিবীতে স্পেনীয় ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪৪ কোটি। পৃথিবীর ২২টি দেশের সরকারি ভাষা হলো স্পেনীয় ভাষা। ৩১টি দেশের মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। তিন নম্বরে অবস্থান করছে ইংরেজি ভাষা। পৃথিবীতে এ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ৩৮ কোটি। ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর মোট ১৮টি দেশের মাতৃভাষা। সর্বাধিক ১০১টি দেশের মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে। আর পৃথিবীতে আরবী ভাষার অবস্থান চতুর্থ। এ ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৩৫ কোটি। সর্বাধিক ২৮টি দেশের মাতৃভাষা হলো আরবী। আর দ্বিতীয় সর্বাধিক ৬০টি দেশের মানুষ আরবী ভাষায় কথা বলে। ইসলামী গবেষকদের মতে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম। আর তার ভাষা ছিল আরবী। ইসলামে বিশ্বাসী প্রাচীন আরব মুসলিমগণ দেশ বিজয়ের পাশাপাশি ভাষাশিক্ষার বিস্তারেও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। কারণ শিক্ষা এবং ধর্মকে তারা আলাদা করে দেখতেন না। তখন শিক্ষা এবং ধর্মকে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিবেচনা করা হতো। আর এ লক্ষ্যে তারা দেশ-বিদেশ ও মহাদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটেছিল আরবী সভ্যতা। প্রাচীন সমৃদ্ধ অসংখ্য ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরবী ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। তাই বিশ্বময় আরবী ভাষার প্রভাব এখনো বিদ্যমান। আরবীয় মুসলিমদের আগমনের গতিধারায় উপমহাদেশে আরবী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। বাংলাসহ উপমহাদেশের প্রতিটি এলাকায় গড়ে ওঠে আরবী শিক্ষা কেন্দ্র। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ আমলে খোদ বাংলাতেই ৮০,০০০ মাদরাসা ছিল। ক্ষমতা দখল করে ব্রিটিশরা বাংলা থেকে ইসলামী সভ্যতার গতিপথ রুদ্ধ করে দিতে থাকে। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বীর বাঙ্গালি বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। মুসলিম কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন। তারা মুসলিমদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দের ধারাবাহিক আন্দোলন আর অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ২৫টি সাব-কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির মধ্যে আরবী ও ফার্সি সাব-কমিটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যটি হলো ইসলামিক স্টাডিজ সাব-কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব আলী চৌধুরীর ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯০২ সালে তিনি ১ লাখ ২০ হাজার টাকা নগদ দান করেছিলেন। মুসলিম জাগরণের অন্যতম এ পথিকৃৎ ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি অনুষদ খোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের ক্ষমতাবলে বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকতা কমিশন আরবীকে ইসলামিক স্টাডিজের সাথে যুক্ত করে দেয়। যুক্ত এ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজকে এ কমিটি একটি বিভাগে পরিণত করে। এভাবে তারা আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজকে সংকুচিত করে একটি বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর ফার্সিকে উর্দূর সাথে যুক্ত করে ফার্সি ও উর্দূ— দুটি বিভাগকে একটি বিভাগে পরিণত করে। সংক্ষিপ্ত এ তথ্যসূত্র এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিভাগ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম বিভাগসমূহের অন্যতম। যে বিভাগকে Integral part বা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর পি, জে, হার্টগ তাই প্রথম কোড সভায় প্রদত্ত প্রথম বক্তব্যে এ বিভাগকে Corner stone বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেই থেকে বাংলাদেশে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী ভাষার উপযোগিতা ও চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ স্বতন্ত্র দুটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে বিভাগ দুটি দেশে শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিভাগ দুটি দেশকে অনেক শ্রেষ্ঠ সন্তান উপহার দিয়েছে। শ্রেষ্ঠ এ সন্তানেরা দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। রাজনীতিতেও তাদের অবদান স্মরণ করার মতো। এ সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : এস এম হুসাইন, সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিচারপতি আব্দুল জব্বার খান, সাবেক স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। আব্দুল হক ফরিদী,

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। ড. সিরাজুল হক, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত, সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ড. এ কে এম আইয়ুব আলী, সাবেক অধ্যক্ষ, মাদরাসা ই আলিয়া, ঢাকা। ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, সাবেক উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও আ না ম রইছ উদ্দিন, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর হতে প্রতিটি সরকারই এ শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর মোট সাতটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয় ২০১০ সালে। এ শিক্ষানীতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। আর এ শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ইসলামী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। আর মানবিক শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ ছিল যে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে— প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা'। শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষাক্রমে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়ে গেল। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-তে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিটকে গেল। আবার প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২০-এ 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টিকে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হলো। অর্থাৎ দশম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়গুলোর বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে এ বিষয়গুলোর ক্লাস-পরীক্ষা নিয়মিত চালু থাকবে। বিষয়গুলোর সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে। এ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করেই একজন শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ধারিত হবে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষাকে বোর্ড পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে এটি গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত হলো। এ বিষয়ে গ্রেড উন্নয়নের জন্য আর কোনো ক্লাস এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কারণ শিক্ষার্থীরা বোর্ড পরীক্ষা ব্যতীত এটি পড়তে কখনোই আর আগ্রহী হবে না। আর শিক্ষকগণও এ বিষয়ে আর কোনো গুরুত্ব দিবেন না। শিক্ষানীতিতে ঘোষিত শিক্ষার্থীদের নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনের যে কথা বলা হয়েছে সেটিও জাতীয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ স্কুল ও কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে পড়াশুনার আর কোনো সুযোগ রইল না। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদরাসার অবস্থাও ভালো না। অনাদর আর অবহেলায় আলিয়া মাদরাসা তার স্বকীয়তা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে যা-ও আছে তার অবস্থাও খুব একটা ভাল না। মাদরাসা থেকে আরবী বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনেকাংশেই লোপ পেয়েছে। পূর্বে এখানে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ও ১০০ নম্বরের বাংলা পড়ানো হতো। বর্তমানে এখানে ২০০ নম্বরের ইংরেজি ও ২০০ নম্বরের বাংলা পড়ানো হয়। অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজির বিষয় সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দাখিল ও আলিমের বিজ্ঞান গ্রুপে আরবী সাহিত্যকে সংকুচিত করে ৫০ নম্বর করা হয়েছে। অর্থাৎ আরবী ১ম ও ২য় পত্রকে যুক্ত করে দুটো মিলিয়ে ১০০ নম্বর করা হয়েছে। আরবী শিক্ষা সংকোচন করে এখানে ব্যাপকভাবে অন্যান্য শিক্ষাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের মেধাকে যথাযথ মূল্যায়ন করছেন না। রাষ্ট্রীয় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। আলিয়া মাদরাসা হলো দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এক ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্র। আরবী ভাষার পাশাপাশি এখানে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোলসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আলিয়া মাদরাসাগুলোতে আরবী ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ দান করা হয়ে থাকে। আরবী, নাহু (বাগবিধি), ছরফ (রূপতত্ত্ব), বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র), ফিক্বহ (আইনশাস্ত্র), ফালসাফাহ (দর্শন) ও সাহিত্য ছিল এ পাঠক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এককথায়, ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অনন্য সমন্বয় হচ্ছে আলিয়া মাদরাসা। কিন্তু বর্তমানে এখানে এসব বিষয় সামগ্রিকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। অথচ এসব আলিয়া মাদরাসা থেকে লেখাপড়া করেই শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়ে থাকেন।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি যে, জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দেওয়া একটি অযৌক্তিক ব্যাপার। এটা একদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অন্যদিকে মুসলিম জীবনের

কদর্য এক হীনমন্যতার বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি এটা একটি ভাষা ও ডিসিপ্লিনের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ। ধর্মীয় প্রয়োজনে মাদরাসাতে আরবী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে ধর্মীয় প্রয়োজনের বাইরেও আরবী শিক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। অর্থনৈতিক সাফল্য, ব্যবসায় সাফল্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়করণে এ ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে রেমিট্যান্স অর্জনের ক্ষেত্রে আরবী ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ দেশের বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্জনে শতকরা ৮০ ভাগই আসে আরবী ভাষাভাষী দেশ থেকে। অর্থনৈতিক এ গুরুত্ব বিবেচনা করে ভারতের মতো একটি হিন্দু প্রধান দেশে আরবী ভাষাকে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়ে থাকে। আরববিশ্বে জনশক্তি রপ্তানির জন্য তাদেরকে আরবী ভাষায় দক্ষ করে তোলা হয়। একইভাবে পাকিস্তানও সেদেশের নাগরিকদের আরবী ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। আরবী ভাষাকে অবহেলার কারণে সঊদী আরবে অধিকাংশ বাঙালিকে ঝাড়ুদার আর সুইপারের মতো নিম্ন পর্যায়ের কাজ করতে দেখা যায়। আরবী ভাষায় অদক্ষ হওয়ার কারণে তারা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিকের মর্যাদা পায়। অপরপক্ষে আরবীতে দক্ষ হবার কারণে ভারত এবং পাকিস্তানের শ্রমিকদের অফিসিয়াল বিভিন্ন সম্মানজনক কাজে নিয়োগ পেতে দেখা যায়। এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। আর এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের সাথে আরব বিশ্বের একটি যোগসূত্র সব সময় ছিল, আছে এবং থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার আমলে মাদরাসাগুলোতে আরবী ভাষার সংকোচন ও শিক্ষানীতির লঙ্ঘন একেবারেই বেমানান। কারণ স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে বাঙালি মুসলিম বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বলে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতেন। তিনি ইসলামের উন্নত গবেষণার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'মক্তব শিক্ষাই হবে এদেশের বুনিয়াদি শিক্ষা'। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০১৩ সালে স্থাপিত হয় ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। ইসলামের মর্মবাণী ও চেতনা প্রসারের নিমিত্তে ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০১০টি দারুল আরকাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ৫৬০টি মডেল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দাওরায়ে হাদীছকে মাস্টার্সের মান প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায় স্কুল, কলেজ থেকে ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। দেশপ্রেমিক জনতা এটাকে কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করতে তারা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে দেশবাসী মনে করেন। এটির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি যেমন ক্ষুণ্ন হবে, তেমনি সরকারের সদিচ্ছাও দেশবাসীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিপদে ফেলতেই কুচক্রী মহল এ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন। মহলটি এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিবেশ বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়ে দিচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন পরিবেশের কথাও তারা মনে রাখছেন না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্টজনেরা এ সাবজেক্টের গুরুত্বকে অস্বীকার করে চলেছেন। তারা তৎকালীন দৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলেছেন। প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস মূল্যায়ন না করেই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও আরবী বিভাগের প্রতি অবহেলা করেই চলেছেন। এটা ধর্মপ্রাণ স্বাধীন জাতির জন্য মোটেই মানানসই নয়। বাংলাদেশের সংবিধান শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' দিয়ে। সংবিধানের ২ এর 'ক' অনুসারে দেশের রাষ্ট্র ধর্ম 'ইসলাম'। আর যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে দেশে ইসলামী শিক্ষা বিষয়টিকে পাবলিক পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া আশ্চর্যজনক স্ববিরোধিতার শামিল। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী নৈতিকতার মূল উৎস হচ্ছে ধর্ম। এমতাবস্থায় পাবলিক পরীক্ষা থেকে ইসলামী শিক্ষা বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাংলা উইকিপিডিয়া কর্তৃক 'বিভিন্নদেশে ধর্মের গুরুত্ব' শিরোনামে একটি তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে 'প্রতিদিনের জীবনে ধর্মের গুরুত্ব' নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৯৯% উত্তর দানকারী ইসলামী শিক্ষার পক্ষে 'হ্যাঁ-সূচক' জবাব দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ধর্মপ্রাণ তাওহিদী জনতার দাবি হলো, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শাখায় ইসলামী শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক! ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টিকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় পূর্বের ন্যায় বহাল রাখা হোক! কুরআন হাদীছের ভাষা হিসেবে এ ভাষার মর্যাদাকে ফিরিয়ে আনা হোক! আরব দেশগুলোর শ্রমবাজারে শক্ত অবস্থান তৈরির সুবিধার্থে আরবী ভাষাকে সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করা হোক! আরববিশ্বে শ্রমিক রপ্তানির নিমিত্তে আরবী ভাষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরির ব্যবস্থা করা হোক! আলিয়া মাদরাসায় আরবী সংকোচন বন্ধ করে আরবী শিক্ষাকে পূর্বের ন্যায় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হোক! দাওরায়ে হাদীছকে শুধু মাস্টার্স এর মান দিলেই হবে না, কর্মক্ষেত্রে তাদের সুযোগ প্রদান করা হোক!

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (৬ষ্ঠ পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ১৩তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ﵂ فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟! قَالَ: نَعَمْ. لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ. تابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وأَبُو صالِحٍ. وتابَعَهُ هِلالُ بْنُ رَدَّادٍ عن الزُّهْرِيِّ. وقالَ يُونُسُ ومَعْمَرٌ: بَوادِرُهُ.

অনুবাদ :

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে লায়ছ হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে উকায়ল হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবায়ের থেকে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অহীর আগমন শুরু হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন সেই স্বপ্ন সকালের মতো তার সামনে সত্যরূপে প্রকাশিত হতো। অতঃপর তার কাছে একাকিত্ব ভালো লাগতে লাগল। তিনি হেরা গুহায় একাকী থাকতেন এবং রাত্রিকালীন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন- যতক্ষণ না পরিবারের কাছে ফিরে প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন না হতো। অতঃপর তিনি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট ফিরে আসতেন তিনি তার জন্য অনুরূপ পাথেয় প্রস্তুত করে দিতেন। এভাবেই তার নিকট একদিন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী চলে আসে এমতাবস্থায় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফেরেশতা তার নিকটে এসে তাকে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়া জানি না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং চাপ দিলেন। পুনরায় বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। ফেরেশতা আমাকে পুনরায় ধরলেন এবং চাপ দিলেন অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। তিনি আমাকে আবারও সজোরে চাপ দিলেন অতঃপর তিনি বললেন, 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাটবাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত'।

এই আয়াতগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূল ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় তার বুক ধড়ফড় করছিল। তিনি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, আমাকে চাদর দাও! চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! অতঃপর খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তার ভয় কেটে গেলে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে তিনি পুরো ঘটনা জানালেন এবং বললেন, আমি আমার জীবনের ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহর কসম! কখনোই নয়! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের সম্মান করেন, বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে সাথে করে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

ইবনু নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় বই লিখতেন। তিনি ইঞ্জীল গ্রন্থকে হিব্রু ভাষায় যতদূর আল্লাহ তাওফীক্ব দিয়েছিলেন লিখেছিলেন। তিনি একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ মানুষ ছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাকে বললেন, হে আমার চাচার ছেলে! আপনার ভাইয়ের ছেলে কী বলে শুনুন! তখন ওয়ারাকা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, আপনি কী দেখেছেন? রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা দেখেছিলেন তাকে তা জানালেন। অতঃপর ওয়ারাকা বললেন, ইনিই সেই 'নামূস' যাকে মহান আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে! তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, সত্যিই কি আমার জাতি আমাকে বের করে দিবে? হ্যাঁ, ইতোপূর্বে কোনো ব্যক্তির নিকটে এই লোক প্রেরিত হয়েছেন আর তাকে তার জাতি বের করে দেয়নি এমনটা হয়নি। তবে তোমার সাথে যেদিন এমন ঘটবে সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি আমি তোমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইন্তেকাল করেন। আর অহী স্থগিত হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবূ ছালেহ (রাহিমাহুল্লাহ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ (রাহিমাহুল্লাহ) যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার (রাহিমাহুল্লাহ) فُؤَادُه এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।]

কঠিন ও অপরিচিত শব্দ :

فَلَقٌ 'ফালাক্ব'- 'লাম' বর্ণে 'যবর' দিয়ে উচ্চারিত হবে। এটি 'ইসম' (বিশেষ্য বা Noun)। ইমাম ইবনুল আছীর বলেন, সকালকে 'ফালাক্ব' বলা হয়। আর 'লাম' বর্ণে 'সাকিন' দিয়ে পড়লে হবে 'মাছদার', যার অর্থ হবে বিদীর্ণ করা। যেহেতু রাতকে বিদীর্ণ করে সকাল উদিত হয়, তাই তাকে ফালাক্ব বলা হয়।

يَتَحَنَّثُ শব্দটি মুযারে মা'রূফ (مُضَارِع مَعْرُوْف) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অর্থপ্রদানকারী কর্তৃবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি ওয়াহেদ মুযাক্কার গায়েব (وَاحِد مُذَكَّر غَائِب) একবচন নাম-পুরুষ। বাবে তাফাউউল (بَاب تَفَعُّلٌ) থেকে এসেছে। শব্দটির মূল অক্ষর হচ্ছে 'হিনছ' (حِنْثٌ), যার অর্থ গুনাহ বা পাপ। এই কারণে ওয়াদা করে ভঙ্গ করাকে হিনছ বলে।

যখন এটি বাবে তাফাউউল (بَاب تَفَعُّلٌ) থেকে এসেছে, তখন এটির অর্থ দাঁড়িয়েছে- এমন কিছু করা, যা পাপ থেকে বের করে দেয় বা পাপকে দূর করে দেয়।[১]

আবার অনেকেই বলেছেন, উক্ত শব্দের 'ছা' (ث) বর্ণটি মূলত 'ফা' (ف) ছিল। তথা মূল শব্দ ছিল 'তাহান্নুফ' (تَحَنُّفٌ) সেখান থেকে উচ্চারণের পরিবর্তনের কারণে 'তাহান্নুছ' (تَحَنُّثٌ) হয়েছে। সেক্ষেত্রে 'তাহান্নুফ' (تَحَنُّفٌ) এসেছে 'হানীফ' (حَنِيْفٌ) শব্দ থেকে। তথা দ্বীনে হানীফের অনুসরণ করা।[২]

قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ 'নুন-ঝা-আইন' (ن- ز-ع) শব্দমূলটি যদি 'নাঝউন' (نَزْعٌ) মাছদার থেকে আসে, তাহলে অর্থ হয় অপসারণ করা বা টানা। আর যদি 'নুঝূউন' (نُزُوْعٌ) (নূন ও ঝা বর্ণে পেশ দিয়ে) মাছদার থেকে আসে, তাহলে অর্থ হয় কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠা। এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণযোগ্য। তথা আগ্রহের সাথে পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চান। আর সেক্ষেত্রে ক্রিয়াটির সাথে 'ইলা ছেলাহ' ব্যবহৃত হয়। যেমনটি হাদীছের বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ কিতাবুত তাফসীর ও কিতাবুত তা'বীর-এ এই জায়গায় فَجِئَهُ 'ফাজিয়া' ক্রিয়া ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে হঠাৎ করে আসা।

غَطَّنِي 'গত্ত্বা' একটি অতীত অর্থপ্রদানকারী কর্তৃবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি ওয়াহেদ মুযাক্কার গায়েব (وَاحِد مُذَكَّر غَائِب) একবচন নাম-পুরুষ। তার শেষে 'ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম' (يَاء مُتَكَلِّم) যুক্ত হয়েছে। 'ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম' (يَاء مُتَكَلِّم) আসার কারণে 'ত্ব' (ط)-এর শেষে যের দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেহেতু 'মাযী' (مَاضِي) তথা অতীত অর্থপ্রদানকারী ক্রিয়ার শেষে সর্বদা যবর হয়, সেহেতু 'ইয়া' (يَاء)-এর পূর্বে 'নূন বেকায়া' (نُوْن وِقَايَة) যুক্ত করা হয়েছে। উক্ত 'নূন বেকায়া'-এর ফলে 'ত্ব' (ط)-এর উপর যবর বাকী রাখা সম্ভব হয়েছে। 'গত্ত্বা' (غَطَّ) শব্দটি বাবে যরাবা (بَاب ضَرَبَ) তথা 'গতীত' (غَطِيْطٌ) মাছদার থেকে আসলে ঘুমের মধ্যে নাক ডাকার অর্থ প্রদান করে। আর বাবে নাছারা (بَاب نَصَرَ) তথা 'গত্তুন' (غَطٌّ) মাছদার থেকে আসলে কাউকে পানির নিচে ডুবিয়ে ধরা বা সজোরে চেপে ধরার অর্থ প্রদান করে থাকে।[৩]

جَهْدُ 'জাহদুন'। قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدِ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ وَقِيلَ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ وَبِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ অর্থাৎ ইমাম ইবনুল আছীর বলেন, 'জাহদুন' ও 'জুহদুন' (جَهْدٌ وَ جُهْدٌ) শব্দ দুটি হাদীছে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। 'জীম' (جِيْم) বর্ণে যবর দিলে অর্থ হবে কষ্ট ও

১. আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছি ওয়াল আছার, ১/১৪৯।

২. ফাতহুল বারী।

৩. আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছি ওয়াল আছার, ৩/৩৭২।

ক্লান্তি এবং 'জীম' (جِيْم) বর্ণে পেশ দিলে অর্থ হবে সাধ্য ও চেষ্টা। তখন হাদীছের অর্থ দাঁড়াবে আমার সাধ্য ও চেষ্টার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অথবা আমার কষ্ট ও ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

فُؤَادُهُ অন্য বর্ণনায় এখানে বাওয়াদির بَوَادِرُهُ শব্দটি 'বাদেরাতুন'-এর বহুবচন। যার অর্থ হচ্ছে— কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝামাঝি অংশ।

زَمِّلُوْنِي 'ঝা-মীম-লাম' (ز-م-ل) শব্দমূল বাবে নাছারা (بَاب نَصَرَ) থেকে আসলে অনুসরণ করা বা পিছনে আরোহন করা বুঝায়। যেখান থেকে 'ঝামীলুন' (زَمِيْلٌ) ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ— সফরসঙ্গী বা বন্ধু। আর বাবে তাফঈল (بَاب تَفْعِيْل) বা তাঝমীল (تَزْمِيْل) মাছদার থেকে আসলে কাপড় জড়ানো বা সুন্দর করে সাজানো অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর প্রত্যেক যা কাপড় দিয়ে জড়ানো হয় তা মূলত সাজানোই হয়। হাদীছে ব্যবহৃত শব্দটি আমর হাযের (أَمر حَاضِر) বা আদেশ অর্থবোধক কর্তৃবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি জমা মুযাক্কার হাযের (جَمع مُذَكَّر حَاضِر) বহুবচন মধ্যম পুরুষ।[৪]

الرَّوْعُ এর (راء) বর্ণে যবর দিয়ে অর্থ হচ্ছে ভয়ভীতি। আর 'র' (رَاء) বর্ণে পেশ দিয়ে 'রূ''-এর অর্থ হচ্ছে অন্তর বা হৃদয়। যেমন স্বয়ং রাসূল ﷺ অন্যত্র বলেন, إِنَّ جِبْرِيْلَ نَفَّسَ فِيْ رُوْعِي 'নিশ্চয় জিবরীল আমার অন্তরে ফুঁকে দিয়েছেন'।

اَلْكَلُّ 'আল-কাল্লু'- শব্দটি 'কাফ' (كَاف) বর্ণে যবর দিয়ে উচ্চারিত হবে। 'কাফ-লাম-লাম' (ك-ل-ل) শব্দমূলটি দুর্বল হওয়া, ক্লান্ত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকেই 'আল-কাল্লু' (اَلْكَلُّ) অর্থ এমন বোঝা, যা মানুষকে ক্লান্ত ও দুর্বল করে দেয়। শব্দটি মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছ (مُذَكَّر ومُؤَنَّث) তথা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। তবে 'কাফ' (كَاف) বর্ণে পেশ দিয়ে 'কুল্লু' (كُلٌّ) পড়লে অর্থ হবে সবকিছু।[৫]

تَكْسِبُ 'তাকসিবু'- মুযারে মা'রূফের (مضَارِع مَعْرُوْف) ছীগাহ তথা ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অর্থপ্রদানকারী কর্তৃবাচক ক্রিয়া। ক্রিয়াটি ওয়াহেদ মুযাক্কার গায়েব (وَاحِد مُذَكَّر غَائِب) একবচন মধ্যম-পুরুষ। 'কাসাবা' (كَسَبَ) শব্দটি যখন বাবে যরাবা بَاب ضَرَبَ থেকে আসে, তখন অর্থ হয় রিযিক্ব অর্জন করা বা অর্জনের চেষ্টা করা। আর যখন শব্দটি বাবে ইফআল (بَاب اِفْعَال) থেকে আসে, তখন অর্থ হবে রিযিক্ব অর্জনে সহযোগিতা করা।[৬]

اَلْمَعْدُوْمَ শব্দটি ইসমে মাফঊল (اِسْم مَفْعُوْل) বা কর্মবাচক বিশেষ্য। ওয়াহেদ মুযাক্কার (وَاحِد مُذَكَّر) বা একবচন পুংলিঙ্গ। 'আইন-দাল-মীম' ع-د-م শব্দমূল থেকে বাবে সামিয়া بَاب سَمِعَ, যার শাব্দিক অর্থ অনুপস্থিত হওয়া বা অস্তিত্ব না থাকা। সুতরাং 'মা'দূম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে যার অস্তিত্ব নেই বা অস্তিত্বহীন।

সুতরাং 'তাকসিবুল মা'দূম' تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ-এর অর্থ দাঁড়াবে অস্তিত্বহীনের জন্য উপার্জন করেন। এখানে মা'দূম مَعْدُوْم-এর পূর্বে একটি গোপন 'লাম' لَام রয়েছে। আর যদি বলা হয় 'তুকসিবুল মা'দূম' تكْسِبُ اَلْمَعْدُوْمَ তাহলে অর্থ হবে অস্তিত্বহীনকে উপার্জনে সহযোগিতা করেন। এখানে ইমাম খত্ত্বাবী অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, অস্তিত্বহীন তথা মৃত ব্যক্তিকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায়। তার জবাবে অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, এখানে 'মা'দূম' দ্বারা যা অচিরেই ঘটবে, তা বুঝানো উদ্দেশ্য। তথা ওই অসহায় ব্যক্তির এই অবস্থা চলতে থাকলে সে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে বা মারা যাবে। কিন্তু এখনো মারা যায়নি। আমরা ব্যবহারিক জীবনে এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকি। যেমন কোনো সন্তান যদি পিতার জীবদ্দশায় বলে- আমিই এই বাড়ির মালিক, তখন অর্থ দাঁড়াবে— তার পিতার মৃত্যু হলে সেই মালিক হবে। এজন্য পূর্বেই নিজেকে মালিক বলে দাবি করছে। যদিও এখনো সে মালিক হয়নি, বরং তার পিতাই মালিক আছে। সুতরাং নিশ্চিত ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করে 'মা'দূম' অস্তিত্বহীন বলা হয়েছে।

এখানে আরও একটা অর্থ অনেকেই করেছেন, আপনি ওই জিনিস উপার্জন করেন, যা সেই দরিদ্র ব্যক্তির কাছে নেই। তথা তখন 'মা'দূম' দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অনুপস্থিত ধনসম্পদ।

نَوَائِبِ الْحَقِّ 'নাওয়ায়েব' শব্দটি 'নায়েবা' نَائِبَةٌ-এর বহুবচন। 'নাবা-ইয়ানূবু-নাওবান' نَابَ-يَنُوْبُ-نَوْبًا শব্দের অর্থে হচ্ছে ঘুরেফিরে বারবার আসা। জীবন চলতে গিয়ে বিপদাপদ আসতেই থাকার ক্ষেত্রে 'নায়েবা' نَائِبَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং 'নাওয়াইবুল হক্ব' نَوَائِبُ الْحَقِّ বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে হক্বের বিপদ বা হক্ব বিপদ। হক্ব বিপদ বলার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে বিপদ দুই ধরনের হতে পারে— একটি হক্ব; অন্যটি না হক্ব। যেমন কেউ মদ ও জুয়ার নেশায় টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফক্বীর হয়ে গেল, এটা হচ্ছে না হক্ব বিপদ। খারাপ কাজে বিপদে পড়া। আর হক্ব বিপদ হচ্ছে ভালো মানুষ। সঠিকভাবে চলার চেষ্টা করে, তারপরও কোনো দুর্ঘটনার কারণে বিপদে পড়েছে।

نَامُوْسٌ 'নূন-মীম-সীন' ن-م-س শব্দমূলটি বাবে যরাবা بَاب ضَرَبَ থেকে আসলে অর্থ হয় কোনো কিছু গোপন করা,

৪. লিসানুল আরাব, ৭/৫৭।
৫. লিসানুল আরাব, ১৩/১০১।
৬. আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছি ওয়াল আছার, ৪/১৭১।

লুকিয়ে রাখা। 'নামূস' نَامُوْسٌ শব্দটি 'ফাঊল' فَاعُوْلٌ-এর ওযনে ইসমে মুবালাগা اِسْم مُبَالَغَة-এর সীগাহ। তথা অত্যধিক গোপনকারী। 'জাসূস' جَاسُوْسٌ ব্যবহার করা হয় মন্দ জিনিস গোপন করার ক্ষেত্রে; 'নামূস' نَامُوْسٌ ব্যবহার হয় কল্যাণকর জিনিস গোপন করার ক্ষেত্রে। আর অহী হচ্ছে কল্যাণকর জিনিস। সুতরাং যেহেতু জিবরীল আলাইহিস সালাম অহীর আমানত হেফাযত করে তা শয়তানসহ অন্যদের নিকট থেকে গোপন করে মহান আল্লাহর পক্ষ হয়ে নবী-রাসূলগণের নিকট পৌঁছিয়ে থাকেন, তাই সেটাকে নামূস বলা হয়।[৭]

جَذَعًا 'জীম ও যাল' جِيْم و ذَال বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে। 'জাযাআন' جَذَعًا শব্দটি মূলত প্রাণীদের দাঁত ও বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন যে উট পাঁচ বছর বয়সে ও যে গরু দুই বছর বয়সে পদার্পণ করে এবং যে ভেড়া এক বছর পূর্ণ করে, তাদেরকে 'জাযাআ' বলা হয়। তথা শিশু থেকে যুবক হওয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই হাদীছে ওয়ারাকা যৌবনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করত শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৮]

مُؤَزَّرًا শব্দটি ইসমে মাফঊল اِسْم مَفْعُول-এর ওয়াহেদ মুযাক্কার وَاحِد مُذَكَّر-এর সীগাহ তথা একবচন কর্মবাচক পুংলিঙ্গ বিশেষ্য। 'আযারা-ইয়াযিরু' أَزَرَ-يَأْزِرُ বাবে যরাবা بَاب ضَرَبَ থেকে এবং 'আযযারা-ইউয়াযযিরু-তাযীর' أَزَّرَ-يُؤَزِّرُ-تَأْزِيْر বাবে তাফঈল بَاب تَفْعِيْل থেকে অর্থ হচ্ছে— শক্তিশালী করা, মযবূত করা। উল্লেখ্য, শব্দটির মূল 'হামজা-ঝা-র' ء-ز-ر নয়, বরং 'ওয়াও-ঝা-র' و-ز-ر।

لَمْ يَنْشَبْ বাবে সামিয়া بَاب سَمِعَ থেকে। শব্দটির অর্থ লেগে থাকা। আঁকড়ে থাকা, ধরে থাকা ইত্যাদি। তথা তিনি বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি নিজেকে; মারা গেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ বা তারকীব :

مِنَ الْوَحْيِ 'মিন বায়ানিয়্যাহ'। مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ 'মিছলা' مِثْلَ শব্দের শেষে যবর হয়েছে গোপন মাওসূফের ছিফাত হিসেবে। তথা মূলত ছিল مَجِيْئًا مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ।

اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ পূর্বের ক্রিয়া 'তাহান্নুছ' تَحَنُّث-এর 'যরফ' ظَرْف হিসেবে হালাতে 'মানসূব' حَالَة مَنْصُوْب বা নছবের অবস্থায় রয়েছে।

فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا এই বাক্যে 'মিছলিহা'-এর 'হা' যমীরের মারজে' নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ইবাদত। কেউ বলেছেন, 'খালওয়াত' বা একাকিত্ব। কেউ বলেছেন, 'সানাত' বা বছর। তথা পরের বছর আবার আগের বছরের মতো খাবার নিয়ে গুহায় যেতেন।

مَا أَنَا بِقَارِئٍ উক্ত বাক্যে 'মা' مَا বর্ণটি 'ইস্তিফহাম' اِسْتِفْهَام তথা জিজ্ঞাসার জন্য, না-কি 'নাফী' نَفِي তথা না-বাচক অর্থ প্রদানের জন্য, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

সীরাত ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে, 'মা আক্বরায়ু' مَا أَقْرَأُ এখানে দুই ধরনেরই অর্থ হতে পারে। 'আমি কী পড়ব?' অথবা 'আমি পড়া জানি না'। জিজ্ঞাসাবোধক পড়ার ক্ষেত্রে দলীল হচ্ছে উরওয়া থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, كَيْفَ أَقْرَأُ তথা 'কীভাবে পড়ব?' উবাইদ ইবনু উমাইর থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, مَاذَا أَقْرَأُ 'কী পড়ব?' ইমাম যুহরী থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, كَيْفَ أَقْرَأُ 'কীভাবে পড়ব?'

অন্যদিকে যারা না-বোধক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে উপরের সকল বর্ণনা মুরসাল আর ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা মুসনাদ মুত্তাছিল এবং বেশি বিশুদ্ধ। আর যেহেতু بِقَارِئٍ এই শব্দে 'বা' بَاء 'হরফে যায়েদা' যুক্ত হয়েছে আর 'বা' بَاء অতিরিক্ত বর্ণটি 'মা নাফেয়া' مَا نَافِيَةٌ-এর পরেই যুক্ত হয়। 'ইস্তিফহামিয়া' اِسْتِفْهَامِيَّة-এর পরে সাধারণত যুক্ত হয় না। সেহেতু না-বোধক অর্থ করাই বেশি প্রণিধানযোগ্য মত।

حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ এই বাক্যে 'জাহদু' جَهْدُ-এর 'দাল' دَال বর্ণে পেশ ও যবর উভয় দিয়েই পড়া যায়। পেশ দিয়ে পড়লে শব্দটি নিজেই 'বালাগা' بَلَغَ 'ফেল' فِعْل-এর 'ফায়েল' فَاعِل হবে। আর যবর দিয়ে পড়লে শব্দটি 'মাফঊল' مَفْعُوْل হবে আর 'ফায়েল' فَاعِل হবে 'গত্তুন' বা চাপানো। উভয় অবস্থায় অনুবাদ দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

পেশ দিয়ে পড়লে 'আমার ক্লান্তি পৌঁছে যায় তার শেষ সীমায়'। যবর দিয়ে পড়লে 'তার চাপানো পৌঁছে যায় আমার ক্লান্তির শেষ সীমায়'।

يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا 'লায়তা' لَيْتَ-এর 'ইসম' اِسْم 'ইয়ায়ে মুতাকাল্লেম' يَاء مُتَكَلِّم আর তার 'খবর' خَبَر হচ্ছে 'জাযাআন' جَذَعًا। সেই হিসেবে 'জাযাআন' جَذَعًا শব্দটি পেশবিশিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু 'খেলাফে ক্বিয়াস' خِلَاف قِيَاس তা যবরবিশিষ্ট হয়েছে। এজন্য অনেকেই বলেছেন, এখানে গোপন 'ফেলে নাক্বেছ' فِعْل نَاقِص আছে। তথা বাক্যের মূল রূপ হচ্ছে— يَا لَيْتَنِي أَكُوْنُ فِيْهَا جَذَعًا 'আকূনু' أَكُوْنُ 'ফেলে নাক্বেস' فِعْل نَاقِص-এর 'খবর' خَبَر হিসেবে এখন যবরবিশিষ্ট হওয়া ঠিক আছে।

(চলবে)

৭. আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছি ওয়াল আছার, ৫/১১৯।

৮. আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীছি ওয়াল আছার, ১/২৫০।

হক্বের মানদণ্ড

মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ

*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(পর্ব-৫)

১. يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وهو سراج أمتي অর্থাৎ ‘আমার উম্মতের মাঝে এমন একজন ব্যক্তি আসবে যার নাম আবূ হানীফা। সে আমার উম্মতের প্রদীপতুল্য’।[১]

২. سيأتي بعد رجل يقال له نعمان بن ثابت الكوفي ويكنى بأبي حنيفة ليحسن دين الله وسنتي على يده অর্থাৎ ‘অচিরেই আমার পরে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম হবে নু‘মান ইবনু ছাবেত আল-কূফী। যার উপনাম হবে আবূ হানীফা। সে আল্লাহর দ্বীন এবং আমার সুন্নাহকে নিজ হাতে সাজাবেন’।[২]

৩. يخرج في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وبين كتفه خال يحي الله تعالى على يده سنتي অর্থাৎ ‘আমার উম্মতের মাঝে আবূ হানীফা নামে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যার কাঁধে তিলক থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার হাতেই আমার সুন্নাহকে জিন্দা করবেন’।[৩]

৪. আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত, ألا أنبئكم برجل من كوفتكم هذه يكنى بأبي حنيفة قد ملئ قلبه علما وحكما وسيهلك به قوم في آخر الزمان الغالب عليهم التنافر يقال لهم البنانية كما هلكت الرافضة بأبي بكر وعمر ‘সাবধান! তোমাদের কূফাবাসীর মধ্য থেকে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার উপনাম হবে আবূ হানীফা। তার অন্তর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। তার মাধ্যমে সে সময়ের সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ ফেরক্বা ‘আলবানানিয়্যাহ’ ধ্বংস হবে। যেমন আবূ বকর ও উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর মাধ্যমে রাফেযীদের ধ্বংস হয়েছিল’।[৪]

লেখক এসব বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে অন্যদের উপর ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

জবাব : এসব বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এসব বর্ণনা দুর্বল, মিথ্যা ও জাল। এসব বর্ণনাকারীরা নিম্নোক্ত হাদীছের মূল টার্গেট। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ‘যে জেনে-বুঝে আমার নামে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল’।[৫]

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো বর্ণনাকারীরা জাল হিসেবে জানা সত্ত্বেও বর্ণনা করে থাকলে সকলের ঐকমত্যে তারা ফাসেক্ব। কেননা সকলের ঐকমত্যে জাল হাদীছ বর্ণনা করা হারাম। আর যদি তারা হাদীছগুলো জাল তা না জেনে বর্ণনা করেন, তাহলে তারা মূর্খ এবং বিভ্রান্ত। এই হাদীছগুলো জাল তা হাদীছের শব্দ থেকে বুঝা যায় এবং মুহাদ্দিছগণও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। নূর উদ্দীন আলী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

سيأتي من بعدي رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى أبا حنيفة ليحيين دين الله وسنتي على يديه (خط) من حديث أنس من طريق أبان وعنه أبو المعلي ابن المهاجر مجهول وعنه سليمان بن قيس كذلك وعنه محمد بن يزيد بن عبد الله السلمي متروك (عد) من طريق الجويباري وناهيك به كذابا.

‘অচিরেই আমার পরে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম হবে নু‘মান ইবনু ছাবেত আল-কূফী। যার উপনাম হবে আবূ হানীফা। সে আল্লাহর দ্বীন এবং আমার সুন্নাহকে নিজ হাতে জিন্দা করবেন। মর্মে বর্ণিত হাদীছটি আবান আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আবুল মুআল্লা ইবনুল মুহাজির বর্ণনা করেছেন যিনি মাজহূল তথা অপরিচিত রাবী। তার থেকে সুলায়মান ইবনু ক্বায়স বর্ণনা করেছেন তিনিও মাজহূল রাবী। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল্লাহ আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন, যিনি মাতরূক (প্রত্যাখ্যাত) রাবী। হাদীছটি আল-জুওয়াইবারীর

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৩০; জামেউল মাসানীদ, ১/১৪; কিতাবুল মাওযূআত, ১/৩৫৫; আল-লাআলিউল মাওযূআত, ১/৪১৭; আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআহ, পৃ. ৪২০; তাযকিরাতুল মাওযূআত, পৃ. ১১১; আল-লু‘লুউল মারসূ‘, হা/৭; কিতাবুল মাজরূহীন, ৩/৪৬; মীযানুল ই‘তিদাল, ১/১০৬; লিসানুল মীযান, ১/১৯৩।

২. তারীখে বাগদাদ, ২/২৮৯; জামেউল মাসানীদ, ১/১৬; কিতাবুল মাওযূআত, ১/৩৩৫; আল-লাআলিউল মাওযূআত, পৃ. ৪১৭; তানযীহুশ শরীআহ, ২/৩০; মীযানুল ই‘তিদাল, ৪/৬৬; আল-কামেল, ১/১৮২।

৩. জামেউল মাসানীদ, ১/১৮।

৪. জামেউল মাসানীদ, ১/১৭।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩।

সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তার ব্যাপারে আর কী বলব, সে তো মিথ্যুক।[৬] তিনি উল্লিখিত বর্ণনার পূর্বে বলেছেন,

حديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي (قا) من حديث أنس وفيه أحمد الجويباري وعنه مأمون السلمي وأحدهما وضعه وذكر الحاكم في المدخل أن مأمونا قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان فقال حدثنا أحمد إلخ فبان بهذا أنه الواضع له فعليه من الله ما يستحقه وجعلوه أيضا من حديث أبي هريرة أخرجه الخطيب من طريق محمد بن سعيد المرزوي البورقي قال الحاكم والخطيب وهو من وضعه.

'ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (ইমাম শাফেঈ), সে আমার উম্মতের জন্য শয়তানের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর (নাঊযুবিল্লাহ)। আর আমার উম্মতের মাঝে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার নাম আবূ হানীফা, সে আমার উম্মতের জন্য প্রদীপস্বরূপ, সে আমার উম্মতের জন্য প্রদীপস্বরূপ। নূর উদ্দীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি আনাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়। এর সনদে জুওয়াইবারী নামক রাবী রয়েছে যার থেকে মামূন আস-সুলামী বর্ণনা করেছেন। আর তাদের দুইজনের একজন হাদীছটিকে জাল করেছেন। 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে তিনি বলেন, মামূনকে বলা হয়েছিল, ইমাম শাফেঈ ও তার খুরাসানের অনুসারীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তরে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেন। অতএব স্পষ্ট হয় যে, তিনি এ হাদীছটি জালকারী। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে তার যা প্রাপ্য সে পাবে। সে উক্ত হাদীছটি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। যা মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল-মারওয়াযী আল-বুরাক্বীর সূত্রে খত্বীব আল-বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকেম এবং খত্বীব আল-বাগদাদী রহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন, মামূন-ই এই হাদীছের জালকারী'।[৭]

ক্বাযী মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী রহিমাহুল্লাহ, وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, وهو موضوع وفي اسناده وضاعان مامون السلمي واحمد بن عبد الله الجويباري والوضع له أحدهما অর্থাৎ 'হাদীছটি মাওযূ' (জাল)। এর সনদে দুইজন জাল হাদীছ বর্ণনাকারী রয়েছে— ১. মামূন আস-সুলামী ও ২. আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-জুওয়াইবারী। তাদের একজন হাদীছটি জাল করেছেন'।[৮] শায়খ ইবনু তাহের রহিমাহুল্লাহ বলেন, আস-সাগানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, 'হাদীছটি মাওযূ' তথা জাল'।[৯] আল্লামাতুত দাহার বা যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুজাদ্দিদু-দ্বীন বলেন, 'ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেঈ রহিমাহুমাল্লাহ-এর প্রংশসা ও অপমান সম্পর্কে কোনো ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত নেই। আর এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সব মিথ্যা ও জাল'।[১০]

সুতরাং চার ইমামের মধ্য হতে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-কে অন্যদের উপর মর্যাদা দানের কোনো ভিত্তি নেই। বরং তারা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের আনছার বা সাহায্যকারী এবং দ্বীনের মযবূত অনুসারী ছিলেন। মীযানুশ শা'রানী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, الأئمة الأربعة كلهم على هدى من ربهم অর্থাৎ 'চার ইমামের সকলেই আল্লাহর সাহায্যে হেদায়াতের উপর ছিলেন'।[১১]

৬. তানযীহুস শরীআহ, ২/৩০; কাশফুল খাফা, ১/৩৩, তিনি বলেছেন, হাদীছটি জাল।
৭. তানযীহুস শরীআহ, ২/৩০।
৮. আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআহ, পৃ. ৪২০, রাবী নং ১৮৫।
৯. তাযকিরাতুল মাওযূআহ, 'আল-আইম্মাতুল আরবাআহ' অধ্যায়, পৃ. ১০১।
১০. সাফরুস সা'দাত ফারসী মা' শরহে আব্দুল হক্ব, পৃ. ৫২৩।
১১. আল-মীযানুল কুবরা, ১/৩৬।

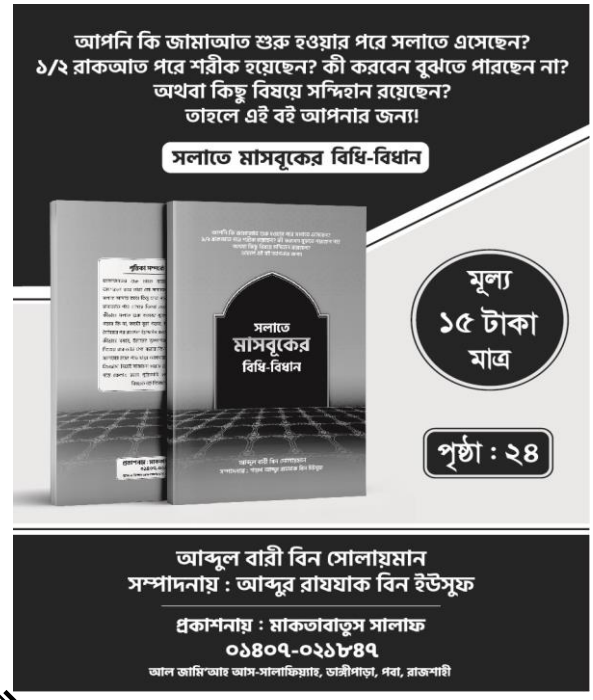

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

মূল : আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ)

*-অনুবাদ : আব্দুল কাদের বিন রইসুদ্দীন**

ভূমিকা :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি আদি পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর সন্তানদের সৃষ্টি করেছেন পাজর ও মেরুদণ্ডের হাড় থেকে। আত্মীয়তা ও বংশের মাধ্যমে গোত্রকে শক্তিশালী করেছেন। জ্ঞান ও সঠিক বুঝের মাধ্যমে তিনি আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। শৈশবে আমার সুন্দর লালনপালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যৌবনে আমাকে রক্ষা করেছেন। আমাকে সন্তান দান করেছেন, যাদের মাধ্যমে আমি পূর্ণ ছওয়াবের আশা রাখি। ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে এবং আমার বংশধরকে ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানান। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমার দু‘আ কবুল করে নিন। হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন’ *(ইবরাহীম, ১৪/৪০-৪১)*।

এরপর যখন আমি বিবাহ ও সন্তানাদির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলাম, তখন আমি এক খতম কুরআন পড়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম যে, তিনি যেন আমাকে ১০টি সন্তান দান করেন। আমার দু‘আ তিনি কবুল করে আমাকে ১০টি সন্তান দান করলেন। পাঁচটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা সন্তান। তাদের মধ্যে দুই কন্যা ও চার পুত্রকে আল্লাহ নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। পুত্রদের মধ্যে রইল কেবল আবুল কাসেম। আল্লাহর কাছে আমি কাকুতিমিনতি করে চাইলাম যে, তিনি যেন আমার এই সন্তানকে সৎ উত্তরসূরী হিসাবে কবুল করেন এবং তার মাধ্যমে আমার মনবাঞ্ছনা পূরণ করেন।

কিছুদিন পর আমি তার পড়াশুনায় কিছুটা অলসতা অনুভব করলাম। তাই এই পত্রখানা লিখে জ্ঞানার্জনের প্রতি তার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াতে চেয়েছি এবং জ্ঞানার্জনে আমার পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছি। সর্বোপরি তাকে আমি তাওফীক্বদাতা আল্লাহ তাআলার দরবারে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছি। কারণ আমি জানি, যাকে তিনি তাওফীক্ব দিবেন তাকে নিরাশ করার কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রষ্ট করবেন, তাকে সুপথ দেখানোর কেউ নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একথাও বলেছেন, ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ‘আর তারা পরস্পরকে হক্ব ও ধৈর্যের ব্যাপারে উপদেশ দেয়’ *(আল-আছর, ১০৩/৩)*। তিনি আরো বলেন, ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ ‘(হে নবী!) আপনি মানুষকে উপদেশ দিন, যদি উপদেশ মানুষের উপকারে আসে’ *(আল-আ‘লা, ৮৭/৯)*। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর হুকুম ছাড়া পাপ কাজ থেকে বাঁচার এবং আনুগত্য করার ক্ষমতা কারোই নেই।

উপদেশ-১ : এই উপকারী অছিয়তের আগে কিছু উৎসাহ ও নিরুৎসাহমূলক বক্তব্য

প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাকে সঠিক বুঝ দান করুন! জেনে রাখো, শুধু জ্ঞান থাকলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় না; জ্ঞানের দাবি অনুসারে কাজ করতে হয়। অতএব, তুমি বিবেককে হাযির করো, চিন্তাকে কাজে লাগাও, নির্জনতা অবলম্বন করো, প্রমাণসহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করো যে, তুমি দায়িত্বপ্রাপ্ত সৃষ্টি। তোমার কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, যা পালনের জন্য তোমাকে তলব করা হয়েছে। দুই জন ফেরেশতা তোমার প্রতিটি কথা ও দৃষ্টির হিসাব রাখছেন। প্রতিটি জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস চূড়ান্ত পরিণতি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ায় বসবাসের সময় অতি সামান্য। কবরে আবদ্ধ থাকার সময়টা অনেক দীর্ঘ। প্রবৃত্তি অনুসারে চলার শাস্তিও ভয়াবহ।

কোথায় গেল গতকালকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসিতা? সে চলে গেছে, কিন্তু রেখে গেছে শুধু এক গুচ্ছ অনুতাপ! কোথায় গেল মনের প্রবৃত্তি? কত মানুষের মাথা সে নিচু করে দিয়েছে! আর কত মানুষের পদস্খলন ঘটিয়েছে! মনের বিরুদ্ধে না চলে কেউ সৌভাগ্যবান হয় না। আবার দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিলে কেউ হতভাগাও হয় না। অতএব, হে বৎস! তুমি শিক্ষা নাও সেই সকল রাজা-বাদশা ও সাধক থেকে, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কোথায় গেল তাদের বিলাসবহুল জীবন? কোথায় গেল সূফী-সাধকের সে কষ্ট-সাধনা?

ভালো মানুষের জন্য রয়ে গেল স্মরণীয় অবদান ও পূর্ণ প্রতিদান। পক্ষান্তরে নাফরমানের জন্য রয়ে গেল মন্দ কথন ও ভয়াবহ পরিণাম। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ‘যে ছিল ক্ষুধার্ত সে আর ক্ষুধার্ত হবে না। আর যে ছিল পরিতৃপ্ত সে কখনও পরিতৃপ্ত হবে না’। ভালো কাজে অলসতা করা কতইনা খারাপ সঙ্গী! যে আরামপ্রিয়তা মানুষের লাঞ্ছনা টেনে আনে, যা তাকে সব ধরনের ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জিন্দেগীতে অভ্যস্ত করে তোলে। সুতরাং বৎস! এই বিষয়ে তুমি সতর্ক থাকবে। নিজের কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করবে। জেনে রাখো, ফরয বিধানসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী। তাই মানুষ যখন সীমালঙ্ঘন করে, তখন তার জন্য থাকে আগুন! শুধুই আগুন!

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

এটাও তুমি ভালো করে জেনে নাও, মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ের সন্ধান করাই ছিল পরিশ্রমী সাধকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। অবশ্য মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ের স্তরে তারতম্য আছে। কেউ মনে করেন 'দুনিয়াবিমুখতা'ই হলো মর্যাদাপূর্ণ কাজ। আবার কেউ মনে করেন, ইবাদতে মশগূল থাকাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ইলম ও আমলের সমন্বয় ব্যতিরেকে মর্যাদা কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই দুটি গুণ কারো মধ্যে একত্রিত হলে সে ব্যক্তি মহান স্রষ্টাকে যথার্থরূপে চেনার পর্যায়ে পৌঁছে দেয় এবং আল্লাহর ভয়-ভালোবাসা ও তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাকে আন্দোলিত করে। আর এটাই হলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। আর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণকারীর সামর্থ্যানুযায়ী সংকল্পের দৃঢ়তা আসে। তবে সকল আশাপোষণকারী লক্ষ্যে পৌঁছায় না তেমনি প্রত্যেক সন্ধানকারী সন্ধান লাভে সমর্থ হয় না। (তাই হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না) বরং মানুষকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ হাদীছে এসেছে, 'যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেওয়া হয়'।[১] আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।

উপদেশ-২ : জরুরী কর্তব্য ও দৃঢ় প্রত্যয়

সর্বপ্রথম যে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত তা হলো, দলীলসহকারে আল্লাহর পরিচয় জানা। এ কথা সুবিদিত যে, যখন কেউ মাথার উপরে আসমান দেখে, পায়ের নিচে জমিন দেখে, মযবূতভাবে নির্মিত স্থাপনা দেখে, বিশেষ করে নিজ দেহের সুনিপুন গঠনশৈলীর দিকে লক্ষ্য করে, তখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, প্রত্যেকটি সৃষ্ট জিনিসের অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছে।

অতঃপর যখন তার কাছে প্রেরিত রাসূল ﷺ -এর সত্যতার প্রমাণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। আর কুরআনই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ, সমগ্র সৃষ্টি যার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর যখন তার কাছে মহা মহিয়ান স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং রাসূল ﷺ -এর সত্যতা প্রমাণিত হবে, তখন তার লাগাম (নিজেকে) শরীআতের সামনে সোপর্দ করা আবশ্যক হয়ে যাবে। যদি এটা সে না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার আক্বীদা-বিশ্বাসে গোলমাল রয়েছে।

অতঃপর ওযূ, ছালাত, (সম্পদ থাকলে) যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরয বিধানের মাসআলাগুলো জানা তার জন্য অপরিহার্য। কারণ যখন সে ওয়াজিবের কদর সম্পর্কে জানবে, তখনই সে তা কাজে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তির উচিত, মর্যাদাপূর্ণ আমলের দিকে ধাবিত হওয়া। অর্থাৎ কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যা (তাফসীর) এবং রাসূল ﷺ -এর হাদীছ মুখস্থকরণে আত্মনিয়োগ করবে। সাথে সাথে রাসূল ﷺ, ছাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের জীবনকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। যেন সে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। পাশাপাশি ভাষা সুন্দর করার জন্য নাহু শাস্ত্র ও বহুল ব্যবহৃত বিষয়গুলো জানা জরুরী।

ফিক্বহ হলো জ্ঞানের মূল। আর উপদেশ জ্ঞানের মিষ্টতা ও ব্যাপক উপকার লাভের মাধ্যম। আল্লাহর অনুগ্রহে এই পুস্তিকায় আমি এমন সব বই থেকে তথ্য সাজিয়েছি, যা পূর্বে রচিত সকল বইয়ের বিপরীতে যথেষ্ট হবে। তোমার বিভিন্ন কিতাব খুঁজে বেড়ানো কিংবা কিতাব রচনার জন্য সাহস সঞ্চয় করার প্রয়োজন পূরণ করে দিয়েছি। মনে রেখো! হীনমন্যতায় না ভুগলে কখনও সাহসে ঘাটতি আসে না।

আমি প্রমাণসহকারে জানি যে, সাহস মানুষের সহজাত ধর্ম। কখনও হয়তো সাহস কমে আসে। উৎসাহ দেওয়া হলে তা আবার সচল হয়। যখন তোমার মনে হবে, তোমার মাঝে ব্যর্থতা ও অলসতা কাজ করছে, তখন তুমি তাওফীক্বদাতা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। কারণ তাঁর আনুগত্য ছাড়া কখনই তুমি কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না। আর কল্যাণ কখনও তোমাকে বিদায় জানায় না তার নাফরমানী ছাড়া। কে এমন আছে যে আল্লাহর কাছে এসে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পায়নি? এমন কে আছে যে আল্লাহবিমুখ হয়ে ফল পেয়েছে কিংবা কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হাছিল করেছে? তুমি কবির কথা শোনোনি?

কসম আল্লাহর!
আমি তো আসিনি সকাশে তব-
বরং এসেছি জমিন মম কাছে গো।
ফের সরতে যখন চেয়েছি দূরে-
আটকা পড়েছি তখন মায়ার বন্ধনে।

উপদেশ-৩ : আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের জ্ঞান দান করবেন

হে বৎস! শরীআতের সীমারেখার (হালাল-হারাম) সামনে তুমি নিজেকে কল্পনা করো, তাহলে বুঝতে পারবে তার ব্যাপারে কতটুকু যত্নশীল। কারণ, যে ব্যক্তি শরীআতের সীমারেখা মেনে চলবে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। আর যে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, তাকে ঢিল দিয়ে দেওয়া হবে। আমি তোমার কাছে আমার কিছু জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করব। হয়তোবা আমার পরিশ্রম দেখে তুমি তাওফীক্বদাতা মহান রবের কাছে আমার জন্য দু'আ করবে। শুনে রাখো বৎস, আমার উপর থাকা প্রচুর অনুগ্রহ আমার অর্জিত সম্পদ নয়। বরং সেটা হলো আমার প্রতি দয়াময় আল্লাহর দান।

(ক) আমার নিজের কথা স্মরণ হয়, আমার অনেক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তখন আমি মক্তবের ছয় বছরের বালক। কিন্তু আমি বড় ছেলেদের সাথে থাকতাম। ছোটবেলা থেকেই আল্লাহ আমাকে প্রচুর ধীশক্তি দান করেছিলেন। আমার মেধা আমার উস্তাযদের চেয়েও প্রখর ছিল। আমার মনে পড়ে না যে, কোনোদিন ছেলেদের সাথে রাস্তায় খেলেছি কিংবা অট্টহাসি হেসেছি।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৭।

(খ) এভাবে আমি যখন কাছাকাছি সাত বছরে বিদ্যাঙ্গনে গিয়েছি, তখন শাখায় শাখায় ভাগ হয়ে বসে থাকা হালাকাগুলো (গ্রুপ স্টাডি) আমার পছন্দ হতো না; বরং আমি হালাকার উস্তাযকে খুঁজতাম। তিনি জীবনচরিত সম্পর্কে বর্ণনা করতেন। যা কিছু শুনতাম, তাই মুখস্থ করে ফেলতাম। অতঃপর বাড়ি ফিরে গিয়ে সবগুলো লিখে রাখতাম। শায়খ আবুল ফযল ইবনু নাছির রহিমাহুল্লাহ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাকে শায়খদের কাছে নিয়ে যেতেন এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য বড় বড় হাদীছের কিতাবগুলো পড়ে শোনাতেন। আমি জানতাম না, কেন আমার সাথে এরকম করা হতো। পাশাপাশি তিনি আমার শোনা হাদীছগুলো সংশোধন করে দিতেন। এভাবে একসময় আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে তার পাণ্ডুলিপিটি প্রদান করলেন। তার মৃত্যুঅবধি আমি তার ছাত্র ছিলাম। আমি তার পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীছ ও হাদীছ বর্ণনা বিষয়ে বিষদ জ্ঞান লাভ করি।

(গ) আমার সমবয়সী বালকরা যখন দজলা নদীতে সাঁতার কাটত, নদীর পুলের উপর বসে আড্ডা দিত, তখন আমি 'রাক্কা'[২]-তে কোনো একটি বই নিয়ে লোকদের থেকে দূরে নির্জনে বসে জ্ঞানার্জনে মগ্ন হতাম।

(ঘ) অতঃপর আমি দুনিয়াবিমুখতার প্রতি অনুপ্রাণিত হই। তখন আমি লাগাতার ছিয়াম পালন করি, অল্প খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হই, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নিজের জন্য আবশ্যক করে নিই। এভাবে জোরালো প্রস্তুতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে রাত্রি জাগরণের চেষ্টা করতে থাকি। জ্ঞানের একটি বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকতাম না; বরং ফিক্বহ, উপদেশ ও হাদীছ শ্রবণ করতাম। দুনিয়াবিমুখীদের অনুসরণ করতাম। ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করতাম।

(ঙ) হাদীছ বর্ণনা করেন কিংবা ওয়ায-নছীহত করেন এমন কোনো লোকের মজলিসে উপস্থিত হওয়া বাদ দেইনি। এমনকি দূরদেশ থেকে আগত অচেনা কোনো লোকের মজলিসও বাদ দেইনি। সবসময় মর্যাদাপূর্ণ বিষয়কেই অগ্রাধিকার দিতাম। আমার সামনে দুটি বিষয় উপস্থিত হলে অধিকাংশ সময় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতাম।

ফলে আল্লাহ আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও প্রতিপালন সুন্দরভাবেই করেছিলেন। আমার উপযুক্ত পথে আমাকে পরিচালিত করেছেন। হিংসুক, শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারীদের আমার থেকে প্রতিহত করেছেন। জ্ঞানার্জনের সকল ব্যবস্থাপনা তিনি করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ আমার কাছে এমন সব জায়গা থেকে কিতাবাদি পাঠাতেন, যা আমি কল্পনাও করতাম না। তিনি আমাকে দান করেছেন বোধশক্তি, দ্রুত মুখস্থশক্তি, লেখনীশক্তি এবং সুন্দর রচনাশক্তি। দুনিয়ার কোনো কিছুর অভাব আমাকে দেননি। তিনি আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ রিযিক্ব দিয়েছেন; বরং বেশি দিয়েছেন। মানুষের হৃদয়ে আমার সীমাহীন গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন এবং আমার কথাগুলো তাদের অন্তরে গেঁথে দিয়েছেন। আমার কথার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তারা কোনো সন্দেহ পোষণ করে না। আমার হাতে প্রায় ২০০ কাফের ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আমার মজলিসে লক্ষাধিক মানুষ তওবা করেছে। আর আমি ২০ হাজারেরও অধিক মানুষের শৈশবের চুল কাটিয়েছি, মূর্খ লোকেরা যার কারণে মানুষকে কষ্টের মধ্যে রাখত।[৩]

(চ) আমি হাদীছ শ্রবণের জন্য উলামা-মাশায়েখদের কাছে ঘুরঘুর করতাম। ফলে জীবিকার সন্ধানে ছুটে বেড়ানো হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম, যেন হাদীছ শ্রবণে কেউ আমাকে ছাড়িয়ে যেতে না পারে। আমি সকালে উঠতাম, তখনও আমার কাছে কোনো খাবার থাকত না। আবার সন্ধ্যা হতো তখনও আমার কাছে খাবার থাকত না। আল্লাহ কখনও আমাকে কারও সামনে বেইজ্জত করেননি; বরং আমার সম্মান রক্ষার্থে আমাকে রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই, তাহলে কথা আরও দীর্ঘ হবে।

(ছ) এখন আমি কেমন আছি তা তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। একটি বাক্যে তার বিবরণ তোমাকে শোনাচ্ছি। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী— 'আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের জ্ঞান দান করবেন' *(আল-বাক্বারা, ২/২৮২)*।

উপদেশ-৪ : সময় সচেতনতা ও প্রতিটি মুহূর্তকে গনীমত মনে করা

বাবা! তুমি নিজের সম্পর্কে সতর্ক হও। বিগত শিথিলতার জন্য অনুতপ্ত হও। সময় ও সুযোগ থাকলে সফল ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পেতে চেষ্টা করো। তোমার গাছে পানি সিঞ্চন করো যতক্ষণ তাতে প্রাণ থাকে।[৪] অযথা নষ্ট হওয়া সময়গুলোর কথা চিন্তা করে দেখো— আলস্যের তৃপ্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, মর্যাদার স্তরগুলোও হাতছাড়া হয়েছে। আর এটাই তোমার উপদেশের জন্য যথেষ্ট।

সালাফে ছালেহীন ফযীলতপূর্ণ আমলসমূহ সংগ্রহ করতে ভালোবাসতেন। কোনো একটি ছুটে গেলে ক্রন্দন করতেন। ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা একজন অসুস্থ ইবাদতগুজার ব্যক্তির কাছে আসলাম। তখন তিনি তার দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার এই দুই পা আল্লাহর রাস্তায় ধুলায় ধূসরিত হয়নি, তাই কাঁদছি'।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৯নং পৃষ্ঠায়)

২. বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলের একটি এলাকা।

৩. সেই সময়ে লোকেরা তওবা করলে মাথায় থাকা শৈশবের চুল কামিয়ে ফেলত।

৪. বেঁচে থাকা অবধি জ্ঞান অর্জন করো।

ঈদ উৎসব

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

মুসলিমদের জন্য ঈদ একটা বিশেষ ধর্মীয় উৎসব। এই দিনে ঈদের জামাআতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এক সঙ্গে ছালাত আদায় করেন। তারপর বন্ধুত্ব, সৌহার্দ, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা, দু'আ এবং আনন্দ ভাগাভাগি করেন সবাই।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য। অপূর্ব অনুভব। ঈদের দিন হয়ে ওঠে মানুষের মহামিলন। মনের রাগ-অভিমান ভুলে গিয়ে একদিনের জন্য হলেও প্রফুল্ল রাখতে হয় মনকে। একটানা ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে বৈচিত্রহীন নিরস জীবনযাপন করুক ইসলাম এমন বিধান আরোপ করেনি।

একঘেয়ে জীবন কারোই কাম্য নয়। সেটা স্থবিরতা ডেকে আনে। এজন্য ইসলাম মুসলিমদের এমন কতগুলো পর্ব দান করেছে, যা উদযাপনে ইবাদতও হয় আবার আনন্দও হয়ে থাকে। ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা তেমনি দুটি উৎসব। ঈদুল ফিত্বর মানে ফিত্বরা দানের উৎসব। বস্তুত এ ফিত্বরা শব্দের মধ্যেও বিদীর্ণ করার অর্থ বিদ্যমান। ফিত্বরা ছিয়াম সাধনার যাবতীয় ভুলত্রুটি বিনাশ করে ছিয়ামকে পূত-পবিত্র করে তোলে। পাশাপাশি নিঃস্ব ও গরীবদের অর্থাভাব বিদীর্ণ করে অর্থ ও আনন্দের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। ফিত্বরা দ্বারা তাদের সাময়িক চাহিদা পূরণ হয়। হাদীছে সুস্পষ্টভাবে এ কথা ফুটে উঠেছে।

মক্কাবাসীরা যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নানা রকমের অত্যাচার শুরু করল, তখন তিনি হিজরত করে মদীনায় আসেন। এসময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার লোকদের দুটি উৎসবে মেতে উঠতে দেখলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এ কীসের উৎসব পালন করছ?' তারা জবাবে বলল, আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে ধারাবাহিকভাবে এ উৎসবদ্বয় পালিত হয়ে আসছে। আমরা তাদের অনুকরণে প্রতিবছর তা উৎযাপন করে আসছি। তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের এ দু'দিনের বদলে এমন দুটি দিন দান করেছেন, যা তোমাদের নির্বাচিত দিনদ্বয়ের চেয়ে উত্তম। একটি হচ্ছে— ঈদুল ফিত্বর এবং অন্যটি ঈদুল আযহা'।[১]

ঈদ উৎসব বিশ্লেষণে বলা যায়, ঈদ সুষম সমাজ গড়ার বাস্তব অনুশীলন। ভ্রাতৃত্ববোধের সুগভীর প্রশিক্ষণ ও মুসলিম উম্মাহর আনন্দ আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার দিন। ঈদ আমাদের জানিয়ে দেয় আমরা মুক্ত। আমরা ইসলামের ভিত্তিতে স্বাধীন জীবনযাপন করছি। আমাদের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই। আমরা কারও অধীনে নই। ঈদ উৎসবটি নিছক অনুষ্ঠান বা শুধু পার্থিব উৎসবই নয়। এটি মুসলিমদের একটি পবিত্র ইবাদত।

ঈদ আমাদের সাংস্কৃতিক দিক-নির্দেশনা দান করে। ঈদবিহীন আমাদের সংস্কৃতি পঙ্গু, অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। ঈদ আত্মকেন্দ্রিক উৎসব নয়। এটি হচ্ছে, সমাজকেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক। এ উৎসবের মর্মবাণী হলো— ধনী-গরীব, ছোট-বড় সবাই মিলেমিশে থাকা।

অথচ সেই ঈদ আমাদের কাছে এখন একটি প্রথাগত উৎসব। ঈদ আমাদের কাছে ব্যবসার মৌসুম। ঈদ আসে আমাদের কাছে বিত্তবানদের সম্পদের প্রদর্শনীর দিন হয়ে। এ দিনে তারা প্রতিযোগিতা করে কে বেশি অর্থ খরচ করে উৎসব পালন করতে পারে। অথচ নিম্নবিত্তদের দিকে তাদের কোনো খেয়াল নেই। তারা ঈদের দিনে ভালো পোশাক পরা তো দূরের কথা একটু ভালো খাবারও খেতে পারে না। এটা আসলেই অমানবিক।

ইসলামের আনন্দ উৎসব বেপরোয়া লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। বরং নির্মল পরিবেশে সুস্থ বিনোদন লাভই এর লক্ষ্য। প্রতি উৎসবে তাকীদ দেওয়া হয় মানবতাবোধে উজ্জীবিত হতে, দুঃখী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতে। মানব কল্যাণই এর প্রধান লক্ষ্য।

যাকাত-ফিত্বরা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোই উদ্দেশ্য, যাতে সবাই উৎসবে শরীক হতে পারে। যাদের অর্থ আছে, তারাই শুধু ঈদের আনন্দ করবে আর যাদের অর্থ নেই, নিঃস্ব তারা মুখ মলিন করে তাকিয়ে দেখবে— তা কিন্তু নয়। সম্পদশালীরা পেট পুরে খাবে, সুন্দর সুন্দর কাপড় পরবে, ফূর্তি করে বেড়াবে আর দুঃখী মানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না— এমন আনন্দ ইসলামে প্রকৃত আনন্দ নয়। ধনী-গরীব সকলে মিলে যে আনন্দ তাকেই বলে প্রকৃত আনন্দ।

ঈদ মানুষকে ভালো হতে শেখায়। সহানুভূতিশীল হতে শেখায়। ভালোবাসা ও সাম্য-মৈত্রীর সমাজ গড়তে শেখায়। আমাদের উৎসবে সকলের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ আছে। ঈদের আনন্দ এক কলুষমুক্ত পবিত্র আনন্দ। এখানে নেই কোনো অপবিত্রতার ছোঁয়া।

পরিশেষে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঈদের খুশি যেন শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে না থাকে, এটি যেন সকল শ্রেণির লোক উপলব্ধি করতে পারে। ধন্য হোক ঈদের দিন। উৎসবে মুখরিত হোক মুসলিম উম্মাহর এ দিনের খুশি।

---

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

১. আবু দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬, ছহীহ।

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর : একটি পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

যাকাতের মতো ছাদাক্বাতুল ফিত্বরও একটি আর্থিক ইবাদত। পবিত্র মাহে রামাযানে ছিয়াম পালন করতে গিয়ে সাধারণত আমাদের অনেক ভুলত্রুটি হয়ে যায়। সেই ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ইবাদতের নাম ছাদাক্বাতুল ফিত্বর। এটি শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, বরং এর আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে, গরীবদের ঈদের খুশিতে শরীক করা।

ফিত্বরা (فِطْرَة) আরবী শব্দ, যা ইসলামে যাকাতুল ফিত্বর (ফিত্বরের যাকাত) বা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর (ফিত্বরের ছাদাক্বা) নামে পরিচিত। ফিত্বর অর্থ ভেঙ্গে ফেলা। ফাতূর বলতে সকালের খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয়, যা দ্বারা ছায়েমগণ ছিয়াম ভঙ্গ করেন।[১]

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কেন আদায় করব?

ছিয়াম পালনকারীদের অনর্থক কথা, কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আত্মশুদ্ধি ও আত্মার আমলকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যাকাতুল ফিত্বর চালু করা হয়েছে। এছাড়াও মিসকীনদের খাদ্য হিসাবে ও তাদেরকে ঈদের দিন মানুষের কাছে চাওয়া হতে মুক্ত রাখার জন্য চালু করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ওয়াজিব করেছেন অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তার কারণে ছিয়ামে ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো দূর করার জন্য ও মিসকীনদের খাদ্য প্রদানের জন্য। ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করলে তা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর হিসেবে গণ্য হবে। আর ঈদের ছালাতের পর আদায় করলে তা অন্যান্য সাধারণ দানের মতো একটি দান হিসেবে গণ্য হবে।[২]

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কারা আদায় করবে?

ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের জন্য নিছাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিত্বরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নিছাব নির্ধারণ করেননি; বরং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন-পরাধীন, ছোট-বড় সকলে উপর ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিত্বর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক ছা‘ পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের ছালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কী দ্বারা আদায় করব?

এ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, كُنَّا نُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদুল ফিত্বরের দিনে এক ছা‘ ত্বআম বা খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা বের করতাম। আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, কিশমিশ, পনির ও খেজুর’।[৪] অপর বর্ণনায় আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, إِنَّمَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমরা কেবল এক ছা‘ খেজুর অথবা এক ছা‘ যব অথবা এক ছা‘ পনির ফিত্বরা বের করতাম। এছাড়া অন্য কোনো জিনিসের সাহায্যে আমরা ফিত্বরা বের করতাম না’।[৫] উল্লেখ্য, হাদীছে ‘ত্বআম’ শব্দটির ব্যাপক অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রকার খাদ্যবস্তু যাকে ‘কূতুল বালাদ’ অর্থাৎ দেশের প্রধান খাদ্যবস্তুসমূহ বলা হয়, এখানে সেই অর্থ নেওয়াই হবে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই ব্যাপক অর্থ যেমন আরবী অভিধান দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি অধিকাংশ অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা সমর্থিত। এটাই শরীআতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া এই অর্থে যেমন ফিত্বরার আদেশ প্রতিপালন করা সহজসাধ্য, তেমনি এর মাধ্যমে ফিত্বরার উদ্দেশ্যও সফল হয়।

উক্ত আলোচনা অনুসারে আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাল। অতএব, আমাদেরকে চালের মাধ্যমেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। ধানের ফিত্বরা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর-এর পরিমাণ :

ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর হাদীছে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসের ছাদাক্বাতুল ফিত্বর হিসেবে

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃ. ৬৯৪।

২. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭, সনদ হাসান।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪; আবূ দাঊদ, হা/১৬১১; তিরমিযী, হা/৬৭৫; নাসাঈ, হা/২৫০৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৪২৫।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৩৯।

৫. শারহু মাআনিল আছার, হা/২৮৬৯।

খেজুর বা যবের এক ছা‘, দাস-দাসী, স্বাধীন ব্যক্তি, পুরুষ-নারী, ছোট-বড়দের উপর ফরয করেছেন এবং তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন ঈদের ছালাতের জন্য মানুষের বের হওয়ার পূর্বে’।[৬] আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أقط أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ ‘আমরা খাদ্যদ্রব্য অথবা যব অথবা খেজুর অথবা পনির অথবা কিশমিশ হতে এক ছা‘ পরিমাণ ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বের করতাম’।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে, صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ‘ফিত্বরা হচ্ছে এক ছা‘ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য’।[৮]

আরবের মানুষের তৎকালীন খাবার ছিল যব, কিশমিশ, খেজুর, পনির ইত্যাদি। যেহেতু বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যদ্রব্য হচ্ছে চাল এবং গম। অতএব, ফিত্বরাও প্রদান করতে হবে এই চাল অথবা গম দিয়ে, যার যেটা প্রধান খাদ্য। আর তা প্রদান করতে হবে এক ছা‘ পরিমাণ। বাংলাদেশের হিসেবে যা আড়াই কেজির সমপরিমাণ।

ছা‘-এর সংজ্ঞা ও পরিমাণ :

আরবীতে ছা‘ (صاع) নির্দিষ্ট পরিমাপের একটি পাত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা শস্যজাতীয় খাদ্য পরিমাপ করা হয়। মাঝারি দেহের অধিকারী মানুষের দুই হাতের তালু একত্র করে চার অঞ্জলিতে যে পরিমাণ খাবার উঠে আসে তাই এক ছা‘। এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যকে ওযন করা হলে মোটামুটি আড়াই কেজি হবে।[৯]

অর্ধ ছা‘ দিয়ে ফিত্বরা আদায়ের বিধান :

নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ছা‘ পরিমাণ ফিত্বরা অবশ্যক করেছেন। কিন্তু নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও চার খলীফার ইন্তেকালের পর যখন মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা নির্বাচিত হন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা হতে দামেস্কে স্থানান্তরিত হয়, তখন তারা গমের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। সে যুগে সিরিয়ায় গমের মূল্য খেজুরের মূল্যের দ্বিগুণ ছিল। তাই খলীফা মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একদা হজ্জ বা উমরা করার সময় মদীনায় আসলে মিম্বারে আরোহণ করে বলেন, আমি অর্ধ ছা‘ গমকে এক ছা‘ খেজুরের সমতুল্য মনে করি। লোকেরা তার এই কথা মেনে নেয়। এরপর থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অর্ধ ছা‘ ফিত্বরার প্রচলন শুরু হয়। বর্ণনাটি এভাবে এসেছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আমরা ছোট, বড়, স্বাধীন, ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক ছা‘ খাদ্য অর্থাৎ গম বা এক ছা‘ পনির বা এক ছা‘ যব বা এক ছা‘ খেজুর বা এক ছা‘ কিশমিশ ফিত্বরা হিসেবে বের করতাম। আমরা এভাবেই ফিত্বরা আদায় করে আসছিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে আমাদের মাঝে আগমন করলেন, তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন এবং বললেন, আমি জানি যে, সিরিয়ার দুই মুদ্দ লাল গম এক ছা‘ খেজুরের সমান। সুতরাং লোকেরা তার এ অভিমত গ্রহণ করল। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন পূর্বের ন্যায় সেই পরিমাণে ও যে নিয়মে দিচ্ছিলাম সেভাবেই দিতে থাকব।[১০]

এক্ষণে প্রশ্ন হলো, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত এক ছা‘ ফিত্বরার পরিমাণ ছাহাবী মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর রায়ের কারণে রহিত হয়ে যাবে কি? কিংবা কোনো ছাহাবীর সিদ্ধান্তের কারণে নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ছেড়ে দিতে হবে কি? এই কারণে ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এই মতের জোরালো বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন, আমি সারা জীবন সেই পরিমাণেই ফিত্বরা বের করব, যে পরিমাণ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বের করতাম।

মনে রাখতে হবে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-সহ অনেক ছাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহর বিপরীতে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর রায়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এটাই নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা।

ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, وَفِيْ صَنِيْعِ مُعَاوِيَةَ وَمُوَافَقَةِ النَّاسِ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ مَحْمُوْدٌ لَكِنَّهُ مَعَ وُجُوْدِ النَّصِّ فَاسد الِاعْتِبَارِ ‘মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ইজতিহাদ এবং মানুষের তা গ্রহণ করার মাধ্যমে ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণিত হয়, যা প্রশংসনীয়। কিন্তু যেখানে দলীল উপস্থিত, সেখানে ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়’।[১১] ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লা-হ) (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, وَلَيْسَ لِلْقَائِلِيْنَ بِنِصْفِ صَاعٍ حُجَّةٌ إِلَّا حَدِيْثَ مُعَاوِيَةَ ‘অর্ধ ছা‘ গমের কথা যারা বলেন, তাদের মুআবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোনো দলীল নেই’।[১২]

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫।
৮. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৭৭০৫।
৯. তাযকীরু ইবাদির রহমান ফীমা আরাদা বিছিয়ামি শাহরি রামাযান, পৃ. ৩১; যাদুছ ছায়েমে ওয়া ফাযলুল ক্বায়েম, পৃ. ২৯।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭৪।
১১. ফাতহুল বারী, ৩/৩৭৪, হা/১৫০৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
১২. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ৩/৪৪৭, হা/৩৮৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা ফিত্বরা আদায়ের বিধান :

নবী ﷺ -এর যুগেও মুদ্রা হিসেবে দীনার এবং দিরহামের প্রচলন ছিল এবং সে যুগেও ফকীর-মিসকীনদের তা প্রয়োজন হতো। তা দ্বারা তারা জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতেন। তা সত্ত্বেও নবী ﷺ মুদ্রা দ্বারা ফিত্বরা নির্ধারণ না করে খাদ্যদ্রব্য দ্বারা নির্ধারণ করেছেন। তাই উপরে হাদীছে বর্ণিত খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিত্বরা আদায় করা সুন্নাত। আর এটাই জমহূর উলামায়ে কেরামের মত। কারণ বর্ণিত খাদ্যবস্তুর বদলে মূল্য তথা টাকা-পয়সা দ্বারা ফিত্বরা দিলে নবী ﷺ -এর আদেশকে উপেক্ষা করা হয়।

যারা মূল্য দ্বারা ফিত্বরা দেন তাদের সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ -কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহর বরখেলাফ হওয়ার কারণে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তা যথেষ্ট হবে না।[১৩]

ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায়ের সময় :

ঈদের ছালাতের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে ফিত্বরা আদায় করতে হবে। এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের ছালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন’।[১৪]

ঈদের দুই-তিন দিন পূর্বে ফিত্বরা আদায় করা যাবে। তাদের দলীল হচ্ছে— আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা -এর হাদীছ, وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ঈদের এক দিন বা দুই দিন আগে ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায় করতেন’।[১৫]

ঈদের ছালাতের পর ফিত্বরা আদায় করলে তা আদায় হবে না; বরং সাধারণ ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পূর্বে ফিত্বরা আদায় করবে, তার দান ফিত্বরারূপেই গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পর ফিত্বরা আদায় করবে, তার দান সাধারণ ছাদাক্বার পর্যায়ভুক্ত হবে’।[১৬]

ফিত্বরার হক্বদার :

এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানগণের মাঝে দুটি মত রয়েছে।

প্রথমত, ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইবনু কুদামা, ইমাম কারখী, হাফেয ইবনু হাযম আর হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণের উক্তি এবং শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভীর সাক্ষ্য অনুসারে চার মাযহাবের প্রকাশ্য ফাতওয়া সূত্রে ফিত্বরার যাকাত সম্পদের যাকাতের নিয়মানুযায়ী বণ্টন করতে হবে।[১৭]

দ্বিতীয়ত, ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা পাওয়ার হক্বদার কেবল ফকীর ও মিসকীন। সূরা আত-তওবায় বর্ণিত অন্য ছয় শ্রেণি ফিত্বরার হক্বদার নয়। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ফরয করেছেন অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রামাযানের) ছওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য।[১৮]

এ মতকে সমর্থন করেছেন ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনু তায়মিয়্যা, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম শাওকানী, আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, ইবনু উছায়মীন প্রমুখ রহিমাহুমুল্লাহ।[১৯]

ফিত্বরা প্রাপ্তির হক্বদার সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি অধিক বিশুদ্ধ। কেননা এ মতের পক্ষে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান।

ফিত্বরা জমা করে কিছুদিন পর বিক্রয় করে মূল্য বিতরণ করা :

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই ফিত্বরা দেওয়া সুন্নাত; অর্থ দ্বারা নয়। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে, ফিত্বরা হিসেবে খাদ্যদ্রব্য জমা হওয়ার পর সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করে অর্থ প্রদান করতে পারে।

ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের উপকারিতা :

১. ঈদের দিনগুলোতে দরিদ্র ব্যক্তিরা ধনীদের ন্যায় স্বচ্ছলতা বোধ করে। ফলে ধনী-গরীব সবার জন্য ঈদ আনন্দদায়ক হয়।

২. ছাদাক্বাতুল ফিত্বরের মাধ্যমে ছিয়াম অবস্থায় ঘটে যাওয়া ত্রুটিগুলোর কাফফারা হয়ে যায়।

৩. ছাদাক্বাতুল ফিত্বর দ্বারা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়।

৪. ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায়ের মাধ্যমে গরীবরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার কারণে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। দরিদ্রদের একদিনের জন্য হলেও অভাব মোচন হয়। এতে তাদের ঈদের খুশিতে অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে সহায়তা করে। ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদায়ের মাধ্যমে দাতা ব্যক্তির অন্তর প্রশস্ত হয়, আত্মা নির্মল ও পবিত্র হয়।

---

১৩. ইবনু কুদামা, মুগনী, ৪/২৯৫।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩৫।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৪১০।
১৬. আবূ দাঊদ, হা/১৬১১; দারাকুত্বনী, ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭।
১৭. ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম, ২/৫৯; আল-মুহাল্লা, ৬/১৪৪; দুররে বহিইয়া (রওযাসহ), পৃ. ১৪২; আল-বাহরুর রায়েক, ২/২৭৫; উমদাতুর রিআয়া, ১/২২৭; শরহে সিফরুস সাআদা, পৃ. ৩৬৯; মুগনী, পৃ. ৭৮।
১৮. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, ‘যাকাত’ অধ্যায়, হা/১৮২৭; দারাকুত্বনী, হাকেম, ১/৪০৯; ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৪৩; ইমাম হাকেম বলেন, বুখারীর শর্তে ছহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।
১৯. মাসায়েলে ইমাম আহমদ, পৃ. ৮৬; মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৫/৭৩; যাদুল মাআদ, ২/২২; নায়লুল আওত্বার, ৩-৪/৬৫৭; আওনুল মা'বূদ, ৫-৬/৩; শারহুল মুমতে, ৬/১৮৪।

ঈদের মাসায়েল

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা :

‘ঈদ’ (عيد) শব্দটি আরবী, যা ‘আউদুন’ (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[১] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[২] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ‘ঈদ’ বলা হয়।[৩]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈদুল ফিত্বর’-এর সূচনা হয়।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু’দিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দু’দিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং ‘ঈদুল ফিত্বর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দু’দিনের পরিবর্তে দু’টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন— ‘ঈদুল আযহা’ ও ‘ঈদুল ফিত্বর’।[৫]

ঈদের ছালাতের আগে করণীয় :

(১) ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক ছা‘ (প্রায় ২.৫০ কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা হিসাবে আদায় করা ফরয।[৬] উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৭] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুমতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবল খুৎবা শ্রবণ এবং দু‘আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৮] এখানে দু‘আ বলতে সম্মিলিত দু‘আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল।[৯]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[১০]

ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়ম :

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকবে।[১১] রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পোঁছে যেতেন।[১২] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ :

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

১. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।
৩. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।
৪. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।
৫. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।
৯. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।
১০. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।
১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।
১২. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।[১৩] উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১৪]

ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল :

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমানিক ১৫ মিনিটি পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাক। এটাই জমহূর আলেমের মত।[১৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১৬]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১৭] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে ছালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবল মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।[১৮] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাতবিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১৯] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[২০]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীআতসম্মত নয়।[২১] ঈদের ছালাতের খুৎবা একটি।[২২] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছসম্মত।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[২৩] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদায় করেননি।[২৪]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[২৫]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!'[২৬]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে দান করলেন।[২৭]

ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা :

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا 'ঈদুল ফিত্বর-এর প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[২৮]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া)

১৩. আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।
১৪. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।
১৫. ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।
১৬. যাদুল মা'আদ।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।
১৮. আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।
২০. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।
২২. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।
২৩. ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।
২৪. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।
২৫. ছহীহ বুখারী, ২/২৩।
২৬. তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।
২৭. ছহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।
২৮. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।

প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২৯] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই ঈদের তাকবীর হবে— প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ'।[৩০] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৩১]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।[৩২] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৩] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[৩৪] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী রাহিমাহুমাল্লাহ একে 'ছহীহ' বলেছেন।[৩৫]

ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়ম :

ঈদের ছালাত দু'রাকআত।[৩৬] নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[৩৭] অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[৩৮] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ক্বমার পড়তেন।[৩৯] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[৪০]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২৯. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।
৩০. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
৩১. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।
৩২. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।
৩৩. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।
৩৪. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
৩৫. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।
৩৬. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।
৩৭. ইবনু খুযায়মা।
৩৮. যাদুল মা'আদ, ১/৪৪১।
৩৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।
৪০. যাদুল মা'আদ, ১/৪২৯।

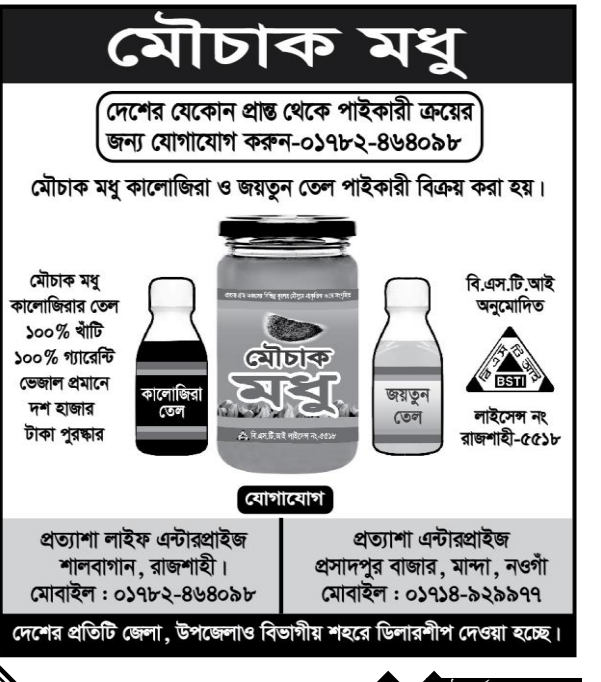

শাওয়ালের ছিয়াম ও অন্যান্য নফল ছিয়ামের গুরুত্ব

*-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন**

হিজরী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার পর শাওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিত্বর উদযাপনের মাধ্যমে শুরু হয় হিজরী ক্যালেন্ডারের দশম মাস শাওয়াল। ইহকালীন জীবন ও জগতের সার্বিক কল্যাণ বিধানে এবং পরকালীন জীবনে শান্তিময় জান্নাত লাভের জন্য রামাযানের ছিয়ামের পাশাপাশি শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়ামসহ সারা বছরের অন্যান্য সকল নফল ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সীমাহীন।

মানবজীবনে আল্লাহভীতি, সহমর্মিতা, ধৈর্য, ত্যাগ ও তাক্বওয়াসহ সকল প্রকার গুণ একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। তাই মানবজীবনটা যাতে ভোগের মোহকে মিটিয়ে দিয়ে ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, মনুষ্য সমাজ যাতে আদর্শিক মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য মহান আল্লাহ মুসলিমদের ওপর মাহে রামাযানের ছিয়ামকে ফরয করেছেন।

তবে ছিয়ামের মহৎ শিক্ষা যেন শুধু রামাযানের একটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বছর জুড়ে জীবনব্যাপী এর অনুশীলন হতে থাকে সেজন্যই রাসূল ﷺ বছরের ১২ মাসের বিভিন্ন সময়ে নফল ছিয়াম নিজে রেখেছেন এবং উম্মাহকে রাখতে উৎসাহিত করেছেন। ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

‘আল্লাহ ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু ছিয়াম ব্যতীত। কেননা তা আমারই জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দিব। ছিয়াম হলো ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন সে যেন স্ত্রীর সাথে উপগত না হয় এবং শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালমন্দ করে অথবা কেউ যদি তার সাথে ঝগড়াবিবাদ করে, তবে সে যেন বলে, আমি একজন ছিয়াম পালনকারী। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উত্তম। ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তির খুশির বিষয় দুটি, যখন সে ইফতার করল তখন ইফতারের কারণে সে আনন্দ লাভ করল এবং যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে, তখন সে তার ছিয়ামের কারণে আনন্দিত হবে’।[১]

ফরয ইবাদতের বাইরে রাসূল ﷺ-এর জন্য অন্য সব ইবাদত ছিল নফল। রাসূল ﷺ ফরয ইবাদতের পর যে সকল নফল ইবাদত নিজে করতেন এবং ছাহাবীগণকে করার জন্য উৎসাহ দিতেন, সেসকল ইবাদতই উম্মতের জন্য সুন্নাত। আমরা জানি, কিয়ামতের দিন নফল বা সুন্নাত ইবাদত দ্বারা ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করা হবে। সুতরাং আমাদের উচিত ফরযের পাশাপাশি সুন্নাত ইবাদতগুলো যথাযথভাবে পালন করা। ফরয ছালাতের পর সুন্নাত ছালাত যেমন রয়েছে, তেমনি রামাযানের ফরয ছিয়ামের পর সারা বছরই বিভিন্ন মাস ও দিনকেন্দ্রিক নফল ছিয়ামও রয়েছে। রামাযান ব্যতীত ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ নফল ছিয়ামের নিয়্যতে অন্য সময়ে মাস ও দিনকেন্দ্রিক যেসব ছিয়াম রাখতেন, সেগুলোই হলো উম্মতের জন্য নফল ছিয়াম। আর নফল ছিয়ামগুলোর মধ্যে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম, প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়্যামে বীযের তিনটি ছিয়াম, প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক ছিয়াম, আরাফার দিবসের ছিয়াম এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের ছিয়াম, আশূরার দিন ও আশূরার আগের দিন, শা‘বান মাসে বেশি বেশি ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফরয ছিয়াম পালনের পর আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নফল ছিয়ামগুলো আল্লাহর বান্দাদের জন্য বেশ সহায়ক। তাছাড়া রামাযানের ছিয়ামের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে নফল ছিয়ামের মাধ্যমে তার পূর্ণতা অর্জিত হবে। রামাযানের পর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়ামসহ অন্যান্য নফল ছিয়াম দ্বারাও আমরা আত্মশুদ্ধি অর্জন এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করতে পারি।

নিম্নে বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সারা বছরের নফল ছিয়ামসমূহের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হলো :

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।

শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম :

নফল ছিয়ামগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম। সাধারণ মুসলিম এই ছয় ছিয়ামকে সাক্ষী ছিয়াম হিসেবে জানলেও পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ বা সুপরিচিত কোনো ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে সাক্ষী ছিয়াম নামটি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত ব্যাপক।

হিজরী সনের দশম মাস শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে মুসলিম উম্মাহর সর্ববৃহৎ জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিত্বর উদযাপনের আনন্দে মুসলিমগণ যাতে রামাযানের মহৎ শিক্ষাটা ভুলে না যায়, সেজন্যই রাসূল ﷺ এ মাসে ছয়টি ছিয়াম রাখতে উম্মাহকে উৎসাহিত করেছেন। আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‘যে ব্যক্তি রামাযান মাসের সব ফরয ছিয়াম পালন করল, তারপর শাওয়াল মাসে আরও ছয় দিন ছিয়াম রাখল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল’।[২]

আলোচ্য হাদীছে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো- শুধু শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম রাখলেই এক বছরের ছিয়াম রাখার ছওয়াব পাওয়া যাবে তেমনটি নয়। আবার শুধু মহিমান্বিত রামাযানে পুরো এক মাস ছিয়াম রাখলে এক বছরের ছিয়ামের ছওয়াব দেওয়া হবে সেকথা কোথাও বলা হয়নি। বরং পুরো রামাযান মাস ছিয়াম রাখার পরে শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি নফল ছিয়াম রাখলে তবেই পূর্ণ এক বছর ছিয়াম রাখার ছওয়াব লাভ করা যাবে সেকথাই রাসূল ﷺ হাদীছে বলেছেন।

বস্তুত হাদীছে পবিত্র কুরআনেরই একটি আয়াতের বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ‘যে ব্যক্তি নেক আমল (সৎকর্ম) করবে, তার জন্য আছে ১০ গুণ ছওয়াব (পুরস্কার)। আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ করবে, তাকে শুধু কৃতকর্মের তুল্য প্রতিফল দেওয়া হবে, তাদের উপর অত্যাচার করা হবে না’ *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*।

সুতরাং রামাযানের এক মাসের ছিয়ামের ১০ গুণ হলো ১০ মাস ছিয়াম আর শাওয়াল মাসের ছয় দিনের ছিয়ামের ১০ গুণ হলো ৬০ দিন ছিয়াম অর্থাৎ দুই মাস।

অর্থাৎ (১০ মাস + ২ মাস) = ১২ মাস বা পূর্ণ এক বছরের ছিয়ামের ছওয়াব লাভের জন্য রামাযানের ছিয়াম রাখার পরে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখার শর্ত থাকলেও যদি কেউ শারঈ কোনো কারণে রামাযানের পূর্ণ মাস ছিয়াম রাখতে না পারেন আর ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরে ক্বাযা আদায় করেন, তাহলে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখা যাবে না বিষয়টি এমন নয়।

আরবী শাওয়াল মাসের অর্থাৎ প্রথমদিকে, মাঝামাঝি দিনগুলোতে অথবা শেষদিকে আবার একাধারে ছয় দিন অথবা এক দিন ছিয়াম রেখে তারপর এক দিন বা দুই দিন বিরতি দিয়ে আবার একদিন যেকোনোভাবে ছিয়াম রাখা যাবে। শাওয়াল মাসের মধ্যে ছয়টি ছিয়াম রাখলেই হাদীছে বর্ণিত ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশা-আল্লাহ।

আইয়্যামে বীযের তিনটি ছিয়াম :

প্রতি আরবী মাস বা চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে হাদীছে সারা বছর ছিয়াম পালনের সমতুল্য বলা হয়েছে।

عَنْ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

ইবনু মিলহান আল-ক্বায়সী রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে আইয়্যামে বীয অর্থাৎ প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিতেন। ইবনু মিলহান বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘এ ছিয়ামগুলোর মর্যাদা (ফযীলত) সারা বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য’।[৩]

সোম ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক ছিয়াম :

প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক ছিয়াম সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ‘প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমি ভালোবাসি ছায়েম অবস্থায় আমার আমলসমূহ পেশ করা হোক’।[৪]

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর আযাদকৃত গোলাম হতে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা তিনি উসামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে কুবা নামক উপত্যকায় তাঁর মালের জন্য গমন করেন। তিনি (উসামা) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বলেন, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার কেন ছিয়াম রাখেন অথচ আপনি একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন। নবী করীম ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘মানুষের আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর সমীপে পেশ করা হয়’।[৫]

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪।

৩. আবূ দাঊদ, হা/২৪৪৯, হাদীছ ছহীহ।

৪. তিরমিযী, হা/৭৪৭, হাদীছ ছহীহ।

৫. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৬, হাদীছ ছহীহ।

সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ঐদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং ঐদিন আমার উপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে'।[৬]

আরাফার দিবসের ছিয়াম :

আরাফার দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি আশা করি যে, আমার এতটা শক্তি হোক'। তিনি পুনরায় বললেন, 'প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করা এবং রামাযান মাসের ছিয়াম এক রামাযান থেকে পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত সারা বছর ছিয়াম পালনের সমান। আর আরাফার দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে'।[৭]

আশূরার ছিয়াম :

হিজরী ক্যালেন্ডারের প্রথম মাস হলো মুহাররম। মুহাররম মাসের ১০ তারিখকে আশূরা বলা হয়। হাদীছে এসেছে, এই দিন ছিয়াম রাখলে পূর্বের এক বছরের পাপ মোচন হয়।[৮] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হচ্ছে রাতের ছালাত'।[৯]

কিন্তু ইয়াহূদীরা একই দিনে ছিয়াম পালন করত বিধায় ছাহাবীগণ এই দিন ছিয়াম রাখার ব্যাপারে আপত্তি জানালে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে মুহাররমের ৯ তারিখেও ছিয়াম রাখব। সুতরাং মুহাররমের ৯ ও ১০ উভয় তারিখেই ছিয়াম রাখা উচিত, যেন ইয়াহূদীদের সঙ্গে সাদৃশ্য না হয়ে যায়'।

এ প্রসঙ্গে আবূ গাত্বাফান রাযিয়াল্লাহু বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশূরার দিন ছিয়াম রাখেন, তখন আমাদেরকেও ঐ দিন ছিয়াম রাখার নির্দেশ দেন। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ তো এমন দিন, যাকে ইয়াহূদী ও নাছারা সম্মান করে থাকে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন আগামী বছর এ সময় আসবে, তখন আমরা মুহাররমের নবম তারিখে ছিয়াম রাখব'। কিন্তু পরবর্তী বছর আগমনের পূর্বেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।[১০]

যিলহজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিনের ছিয়াম :

হাদীছের ভাষ্যে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোনো আমলই আল্লাহর কাছে এত বেশি প্রিয় নয়। সে হিসেবে এ মাসের প্রথম ৯ দিন ছিয়াম পালনের ফযীলত অনেক। উল্লেখ্য, এ মাসের ১০ তারিখ যেহেতু ঈদুল আযহা, সেহেতু এ দিন ছিয়াম রাখা হারাম। আর এ মাসের ৯ তারিখই হলো আরাফার দিন।

এ প্রসঙ্গে হুনায়দা ইবনু খালেদ তাঁর স্ত্রী হতে এবং তিনি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো এক স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জের প্রথম ৯ দিন ও আশূরার দিন ছিয়াম রাখতেন। আর তিনি প্রতি মাসে তিন দিন, প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন।[১১]

শা'বান মাসের ছিয়াম :

হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের পূর্ণ মাসের ছিয়ামের পর শা'বান মাসেই সবচেয়ে বেশি ছিয়াম পালন করতেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতে শুনেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাসসমূহের মধ্যে (নফল) ছিয়ামের জন্য প্রিয়তম মাস ছিল শা'বান মাস। এরপর তিনি রামাযানের ছিয়াম রাখা শুরু করতেন।[১২]

এ প্রসঙ্গে অন্য এক বর্ণনায় আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে এত বেশি ছিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) ছিয়াম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) ছিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রামাযান ব্যতীত কোনো পুরো মাসের ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এত বেশি (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি।[১৩]

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, বছরের কোনো কোনো দিনে নফল ছিয়াম রাখার বিশেষ ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে। আসুন! রামাযানের পর এই ছিয়ামগুলো পালনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সচেষ্ট হই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এই নফল ছিয়ামগুলো রাখার মতো শক্তি এবং মানসিকতা দান করুন- আমীন!

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩।
১০. আবূ দাঊদ, হা/২৪৪৫, হাদীছ ছহীহ।
১১. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৭, হাদীছ ছহীহ।
১২. আবূ দাঊদ, হা/২৪৩১, হাদীছ ছহীহ।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬৯।

মুসলিম উম্মাহর ওপর কুরআনুল কারীমের গুরুত্ব

অনুবাদ : মাহবুবুর রহমান মাদানী

*[৮ শা'বান, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১১ মার্চ, ২০২২। পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আওয়াদ আল-জুহানী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক **শায়খ মাহবুবুর রহমান মাদানী।** খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি পরম প্রতাপশালী, বড় দাতা। যিনি বাদশাহদের বাদশাহ, প্রতিপালনকারীদের রব। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের জন্য সঠিক পথের দিশারী ও উপদেশ। আর তিনি তাতে গচ্ছিত রেখেছেন উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান, অকাট্য প্রমাণাদি, চূড়ান্ত প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতা। দরূদ বর্ষিত হোক আমাদের নেতা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর। যিনি আমাদের নিকট কুরআনুল কারীম, বিভিন্ন নিদর্শনাবলি, ও বিজ্ঞানময় উপদেশ নিয়ে এসেছেন। তিনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। আর যারা অভিযান চালান, লড়াই করেন ও জিহাদ করেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন উত্তম। ক্বিয়ামত পর্যন্ত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সকল ছাহাবীর প্রতি।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। কারণ আল্লাহভীরুতাই হলো উত্তম এবং লাভজনক ব্যবসা। আর তোমরা আল্লাহর নাফারমানী করা হতে সতর্ক হও। সে বান্দা ব্যর্থ হয়েছে যে, তার রবের আদেশের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। আর যুলুম বা অবিচারকে ভয় করো। কেননা যুলুম হচ্ছে অপমান, অগ্নি এবং অশ্লীলতা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তাআলা মহান উদ্দেশ্য এবং বিরাট প্রজ্ঞা নিয়ে কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন আর তা হলো সৃষ্টিজীবের সংশোধনের জন্য সৃষ্টিকর্তার পথ ও পন্থা। কুরআন অবতীর্ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের মধ্যে আত্মার সংস্কার, হৃদয়ের সংশোধন, মেজাজ সুগঠিতকরণ এবং মানুষকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করা। কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি তাতে পায় তার জীবনের চাওয়া-পাওয়া, মানুষের প্রয়োজন এবং যা তাদেরকে দ্বীন, দুনিয়া ও পরকালে সৌভাগ্যবান করবে তার সবকিছুই। আর কুরআন সবকিছুকেই তার অন্তর্ভুক্ত করেছে। কল্যাণের সকল পথকেই তাদের জন্য বর্ণনা করেছে ও তার পথ দেখিয়েছে। অপর দিকে অকল্যাণের সকল রাস্তা থেকে বাধা দিয়েছে ও সেখান থেকে তাকে হুঁশিয়ার করেছে।

কুরআন মানুষের আক্বীদা, চরিত্র, লেনদেন এবং তাদের সকল বিষয়কে সংশোধন করে এমন সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে জাতিকে তার রবের প্রতি বিশ্বাসী করে গড়ে তোলার জন্য। যাতে তারা যেকোনো পরিস্থিতির সামনে স্থির থাকতে পারে, হক্কের দিকে পথপ্রদর্শন করতে পারে, সত্যের জন্যই তর্ক করে এবং অধিকারের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

আর আল্লাহর আদেশে কুরআন এমন এক জাতি গঠন করেছে যারা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল, কোমল এবং শত্রুদের প্রতি অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বনকারী। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যে সব লোক তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র। তাদেরকে তুমি দেখবে রুকূ ও সিজদায় অবনত অবস্থায়, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে নিয়োজিত' *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৯)*।

উক্ত সম্মানিত জাতি ছিল প্রভুত্বের ক্ষমতার নিদর্শনের মধ্য হতে একটি নিদর্শন। পৃথিবীতে আল্লাহ যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁর নির্দেশে তা সৃষ্টি হয়েছে, যমীনে আল্লাহ যা চালু করতে চেয়েছেন তা চালু হয়েছে। সেই উম্মত মানবতার জন্য পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র আক্বীদা স্থির করেছে, খাঁটি কল্পনা অঙ্কন ও সঠিক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে এবং ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বাস্তবায়ন করেছে।

আল্লাহর নির্দেশে এখনও কুরআন সক্ষমতা রাখে আমাদের জন্য সেই রকম সম্মানিত জাতির নমুনা বের করে আনতে। তবে এই উম্মতের যুবসমাজের জন্য আবশ্যিক হলো তাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকেরা যার উপর চলেছেন সেই পথের উপর চলা। যেমন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা, তাঁর উপর ভরসা করা, এককভাবে আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করা, তাঁর তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা, তাঁর ওয়াদা ও ভীতিকে সত্যায়ন করা। আর এটাই ছিল রাসূল ﷺ, তাঁর ছাহাবী এবং সোনালী যুগের লোকদের চরিত্র। ঐ চিত্রটি যদি কোনো মুমিন ব্যক্তির হৃদয়ে স্থির হয়, তাহলে সকল দুর্ঘটনা এবং সমস্ত বিবাদের সামনে সে টিকে থাকবে।

রাসূল ﷺ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন, يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ 'হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাব, তুমি আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে

চলবে তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলবে তাহলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখো! সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো উপকার করতে পারবে না, আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোনো অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে'।[১]

হে মুসলিমগণ! সবচেয়ে বড় মাধ্যম, যার মাধ্যমে মুসলিমরা অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে শক্তিশালী, সম্মানিত হবেন এবং যার আলোকে তারা নিজেদের জীবনের মানহাজ বা কারিকুলাম প্রতিষ্ঠা করবেন তা হলো আল্লাহর কিতাব। আর সম্মান অর্জনের রাস্তাগুলো হলো আল্লাহর কিতাবের খেদমত করা। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক' *(আল-হিজর, ১৫/৯)*।

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি তাঁর বান্দার উপর তাদের বক্ষসমূহে ও অন্তরসমূহে এবং লেখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করাকে সহজতর করেছেন। অতঃপর সম্মানিত খত্বীব বলেন, বাদশাহ আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর হাতে রাজকীয় সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বর্তমান বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয হাফিযাহুল্লাহ পর্যন্ত তাদের বড় বড় কাজের মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো আল্লাহর কিতাবের খেদমতের কাজে ব্যাপক আঞ্জাম দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ 'তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল আর আমি তাদের হেদায়াত বা ঈমান বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম' *(আল-কাহফ, ১৮/১৩)*। এরপর খত্বীব সাহেব নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুৎবা শেষ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ 'নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায় যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত আর যারা সৎ কাজ করে সেই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার' *(আল-ইসরা, ১৭/০৯)*।

দ্বিতীয় খুৎবা

সম্মানিত খত্বীব দ্বিতীয় খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর রাসূল ﷺ-এর উপর, তার পরিবার, ছাহাবায়ে কেরাম এবং যারা তার পথে চলে তাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করেন। এরপর তিনি বলেন, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না সময় নিকটবর্তী হবে, একটি বছর হবে একটি মাসের সমান। একটি মাস হবে এক জুমআর সমান। আর জুমআ হবে এক দিনের সমান। আর এক দিন হবে এক ঘণ্টার সমান। আর ঘণ্টা হবে আগুনের একটি শিখা উঠার পরিমাণ সময়'।[২]

উক্ত হাদীছে রাসূল ﷺ ক্বিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করেছেন আর তা হলো সময়ের বরকতের স্বল্পতা ও তার থেকে উপকারিতা কম নেওয়া, অধিকাংশ মানুষের ব্যস্ততা হলো দুনিয়ার চাকচিক্য নিয়ে, উপকারিতা নেই এমন কাজে সময় নষ্ট করা। সেজন্য তারা সময় থেকে কোনো উপকার গ্রহণ করতে পারে না, সেটা দুনিয়াবী কাজেও পারে না, দ্বীনের কাজেও না। সম্ভবত এর কারণ হলো নে'মত ও কল্যাণের ব্যাপকতা এবং আরাম-আয়েশের পরিপূর্ণতা। মানুষের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাকে খাওয়া, পান করা, উপভোগ ও খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং খানা ও পানি গ্রহণ করা হয় আল্লাহর আনুগত্যে শক্তি যোগানোর জন্য। হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁর দেওয়া নে'মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। অতঃপর সম্মানিত খত্বীব নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছ পাঠ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর দরূদ (রহমত) প্রেরণ করেন। (অতএব) হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 'যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় সে যেন আমার উপর দরূদ পড়ে, কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন'।[৩]

পরিশেষে, সম্মানিত খত্বীব চার খলীফার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেন। অতঃপর বৃষ্টির জন্য এবং সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে নিম্নের আয়াত পাঠ করে খুৎবা শেষ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' *(আন-নাহল, ১৬/৯০)*।

১. তিরমিযী, হা/২৬১৬, হাদীছ ছহীহ।

২. তিরমিযী, হা/২৩৩২; মিশকাত, হা/৫৪৪৮, হাদীছ ছহীহ।

৩. আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৪৯৪৮।

যেমন ছিল নবীজীর চরিত্র

-তাওহীদুর রহমান ইবনু মঈনুল হক*

চরিত্র কী?

চরিত্র শব্দটি চরিত থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো জীবনাচার। যেমন : ছাহাবীগণের জীবনীসংক্রান্ত বইয়ের নাম রাখা হয়েছে ‘ছাহাবা চরিত’। অর্থাৎ ছাহাবীগণের জীবনী বা ছাহাবীগণের জীবনকথা। চরিত্রের আরবী হচ্ছে খুলুকুন, যার বহুবচন আখলাক, যার অর্থ হচ্ছে স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ও শিষ্টাচার। সুতরাং আমরা বলতে পারি- ‘জীবনে চলার পথে আমাদের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে স্বভাব ফুটে উঠে, তারই নাম চরিত্র’। অন্যভাবে বলা যায়- মানবজীবনের সকল আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টিই হচ্ছে চরিত্র।[১] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, الدِّينُ كُلُّهُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ। ‘চরিত্রই হচ্ছে দ্বীন। চরিত্রের দিক দিয়ে যিনি তোমার চেয়ে বেশি অগ্রসর, দ্বীনের দিক দিয়েও তিনি তোমার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর’।[২]

আমাদের জীবনে চরিত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমরা সাধারণত কোনো মানুষকে ভালো-মন্দের বিচার করে থাকি তার চরিত্রের মানদণ্ডে। এজন্যই ইসলাম উত্তম চরিত্রের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। নিম্নবর্ণিত হাদীছগুলো অধ্যয়ন করলেই বোঝা যাবে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব। একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, تَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الأَجْوَفَانِ: الْفَرْجُ وَالْفَمُ، وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ‘তোমরা কি জানো, কোন জিনিসটি অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে?’ ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, ‘দুইটি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। আর (তোমরা কি জানো) কোন জিনিসটি অধিক পরিমাণে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? (সেগুলো হলো) আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র’।[৩]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ‘ঐ মুমিন ঈমানে পরিপূর্ণ, যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট’।[৪] নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ‘নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার ভালো চরিত্রের মাধ্যমে (দিনে) ছিয়াম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে’।[৫]

এছাড়াও অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, যা উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব বহন করে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র কেমন ছিল?

আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন, এটা কেবল মুসলিমজাতি মেনে নিয়েছে তা নয়, বরং মুসলিম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও এটা মানতে বাধ্য হয়েছে যে, তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মহাপুরুষ। একজন অমুসলিম বিশ্ববিখ্যাত লেখক মাইকেল এইচ হার্ট তিনি ‘দি হানড্রেড’ নামে একটি বই লিখেছেন, যার জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। সেই বইয়ে তিনি ১০০ জন ভুবনবিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকাহিনী লিখেছেন, যার মধ্যে তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম প্রথম স্থানে উল্লেখ করেছেন একমাত্র তাঁর প্রভাব ও আদর্শের জন্যই।

একজন কবি ছাহাবী হাসসান ইবনু ছাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে বলেছেন,

وَأَحْسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَينِي
وَأَجْمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ
خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ
كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

‘আপনার চেয়ে সুন্দর আমার দু‘চোখ কাউকে কখনো দেখেনি। আপনার চেয়ে সুন্দর সন্তান কোনো নারী কখনো জন্ম দেয়নি। আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল দোষত্রুটি মুক্ত করে। যেমনটি আপনি চেয়েছেন, ঠিক তেমন করেই যেন আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে’।

কবির এই কবিতাই বলে দিচ্ছে কেমন ছিলেন তিনি। কেমন ছিল তার অনুপম চরিত্রের সৌন্দর্য। অনুভব করে বুঝার বিষয় অথবা বুঝানোর বিষয় নয়। এজন্য তাঁর উন্নত আদর্শের স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ‘আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন’ *(আল-ক্বালাম ৬৮/৪)*। এজন্যই তো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চলন্ত কুরআনও বলা যেতে পারে, যেমনটি আম্মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ ‘তাঁর চরিত্র

---

* শিক্ষার্থী, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত।

১. চাই সুন্দর চরিত্র, পৃ. ১ (সামান্য পরিবর্তিত)।

২. মাদারিজুস সালিকীন, ২/২৯৪।

৩. আদাবুল মুফরাদ, হা/২৮৯, হাদীছ হাসান।

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮২, হদীছ ছহীহ।

৫. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৯৮, হাদীছ ছহীহ।

ছিল আল-কুরআন'।[৬] অর্থাৎ কুরআন মাজীদে যে সকল উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার উল্লেখ রয়েছে, সে সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। কুরআনে বর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা উত্তম চরিত্র আর কী হতে পারে? **তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের চরিত্রমালার জীবন্ত প্রতীক।**

অতএব, আমরা আমাদের চরিত্র গঠন করব একমাত্র নবী ﷺ-এর আদর্শানুযায়ী; কোনো দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা রাজনীতিবিদের আদর্শ অনুযায়ী নয়। তবেই আমাদের সফল হওয়া সম্ভব। যেহেতু উত্তম আদর্শ একমাত্র নবী ﷺ-এর মধ্যেই রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ' *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*।

নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

১. সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা : নবী ﷺ কেমন সত্যবাদী ছিলেন, সত্যবাদিতার শিক্ষা কত তাকীদের সাথে দিয়েছেন, শুধু শিক্ষাই নয়, সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত করার জন্য তাঁর ছাহাবীগণকে কীভাবে তারবিয়াত করেছেন, সুন্নাহ ও সীরাতের কিতাবে তা বিস্তারিতভাবে আছে। তাঁর জীবনের, স্বভাবের এক উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সত্যবাদিতা। নবুঅতের আগ থেকেই তিনি তাঁর সমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে। মক্কার কাফের-মুশরিকরাও তাঁকে 'আল-আমীন' বলে ডাকত। এমনকি আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লা-হু আনহু যিনি ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর প্রাণের দুশমন ছিলেন এবং তার মর্যাদাহানীর সুযোগ খুঁজছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলছেন যে, আমরা তাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারিনি।[৭] আমরা সবাই এই বিষয়গুলো জানি। এই প্রসিদ্ধি কি এক দিনে অর্জিত হয়েছিল? না, এক দিনে হয়নি। সম্মান ও মর্যাদা এক দিনে গড়ে ওঠে না। তা গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে— নানা ঘটনায়, নানা পরিস্থিতিতে। আরবের কুরাইশের মাঝে তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর কথা-কাজ, আচার-আচরণ, শৈশব, কৈশোর, যৌবন সবই তাদের সামনে ছিল। এই দীর্ঘ জীবনে তাঁর কর্ম ও আচরণ থেকে তাঁর সমাজ এই বিশ্বাস গ্রহণ করেছে যে, এই মানুষটি একজন সত্যবাদী, আমানতদার মানুষ।

তার একটি বড় দৃষ্টান্ত— দাওয়াতের প্রথম দিকের ঐ ঘটনা তো আমাদের সবারই জানা আছে। ছাফা পাহাড়ের ঘটনা। ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, (কুরআন মাজীদে নিকটাত্মীয়দের দাওয়াতের আদেশ— وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, 'আপনার নিকটস্থ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে সতর্ক করুন') নাযিল হওয়ার পর নবী ﷺ ছাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'ইয়া সাবাহাহ!' অর্থাৎ বিপদ! বিপদ! কুরাইশের লোকেরা পাহাড়ের সামনে উপস্থিত হলো। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَن خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي 'আমি যদি তোমাদের বলি যে, একটি শত্রুদল এই পাহাড়ের ওপার থেকে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?' সকলে বলল, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا 'আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি'। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য এক কঠিন আযাবের সতর্ককারী'।[৮]

এই ঘটনায় অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। তবে এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি হচ্ছে নবী ﷺ সম্পর্কে তার জাতির সাক্ষ্য, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا 'আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি'। তিনি কত সত্যবাদী ছিলেন এখান থেকে সেটি বুঝা যায়![৯]

২. দয়া-মমতা : দয়া করা একটি মহৎ গুণ, যা মানুষের উচ্চ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার উপরও দয়া করা হয় না।[১০] মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু ছিলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ। তিনি শুধু মানুষের উপর দয়া করেননি, বরং পশু-পাখি ও জন্তু-জানোয়ারের উপরেও দয়া করেছেন এবং দয়া করতেও অন্যকে আদেশ করেছেন। যেহেতু তাঁকে পাঠানোই হয়েছিল সারা বিশ্বজাহানের জন্য রহমত তথা দয়াস্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ 'আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি' *(আল-আম্বিয়া, ২১/১০৭)*। নবী ﷺ কত দয়ালু ছিলেন তার একটি বড় দৃষ্টান্ত, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলছেন, خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ 'আমি ১০টি বছর নবী ﷺ এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি 'উহ!' শব্দটি করেননি। এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?'[১১] এই ছিল নবী ﷺ এর দয়া একজন খাদেমের সাথে।

৩. বিনয় ও নম্রতা : নবী ﷺ ছিলেন উচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি, রাষ্ট্রনায়ক, সুবিচারক ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনো রকমের গর্ব অহংকার ছিল না। তিনি এত নম্র ও ভদ্র ছিলেন যে, সাধারণত তিনি ছাহাবীদগণের মধ্যেই বসতেন। ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আসলে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত বলতে পারতেন না যে, কোন ব্যক্তিটি নবী ﷺ।[১২]

৬. ছহীহুল জামে', হা/৪৭১১।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৭১।
৯. প্রবন্ধ: নবী-জীবনে সত্যবাদিতা, মাসিক আল কাউসার, এপ্রিল ২০১৮।
১০. ছহীহ জামে', হা/৬৫৯৮, হাদীছ ছহীহ।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৩৮।
১২. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯৮, হাদীছ ছহীহ।

তিনি কেমন নম্র ও ভদ্র ছিলেন তার আরেকটা দৃষ্টান্ত— তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বাড়িতে থাকতেন, তখন পরিবারের ছোটখাটো কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করতেন। স্ত্রীদের পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতেন, যা দ্বারা নম্রতার প্রকাশ পায়। আসওয়াদ রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকাবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ 'ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গের সহায়তা করতেন। আর ছালাতের সময় হলে ছালাতের জন্য চলে যেতেন'।[১৩] একদা আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু একদল শিশুর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি তাদের সালাম দিয়ে বললেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও এমনটি করতেন'।[১৪] অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন বড় মানুষ হয়েও ছোট বাচ্চাদের সালাম দিতেন, যেটি তার বিনয় ও নম্রতারই প্রমাণ করে।

৪. সহনশীলতা : কোনো অপছন্দনীয় জিনিস দেখে বা কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সহনশীলতা বলে। সহনশীলতায় প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোচ্চ আদর্শ।

তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত— আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তখন তিনি নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড়ের চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে টেনে ধরল। অবশেষে আমি দেখলাম, জোরে টানার কারণে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। অতঃপর বেদুঈন বলল, আল্লাহর যে সম্পদ আপনার নিকট আছে তা হতে আমাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দিন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দিলেন'।[১৫] এই ছিল নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর সহনশীলতা।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিলেন। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ 'তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ, তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে; কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি'।[১৬]

নবীজীবনের সবকিছুই তো উম্মতের জন্য শিক্ষা। এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরাও যেন নিজেদেরকে সহনশীলতার মহোত্তম গুণে গুণান্বিত করি।

৫. ন্যায়পরায়ণতা : ন্যায়পরায়ণতা মানবচরিত্রের এক মহৎ গুণ, যার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ফিরে আসে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি ধনী-গরীব, ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে মানুষ হিসেবে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। এমনকি শত্রু-মিত্রের মধ্যেও কোনো ভেদাভেদ করতেন না।

তার একটা বড় দৃষ্টান্ত— উরওয়া ইবনুয যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর যামানায় মক্কা বিজয় অভিযানের সময়ে এক সম্ভ্রান্ত গোত্রের স্ত্রীলোক চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর কাছে এসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ জানালো। উরওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, উসামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এ বিষয়ে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে কথা বলামাত্র তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর একটি শাস্তির ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হামদ-ছানা করে বললেন, 'আম্মা বা'দ' তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এজন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার উচ্চ শ্রেণির কোনো লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে কোনো দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত। অতঃপর শপথ করে বললেন, 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই মহিলাটির ব্যাপারে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হলো। পরবর্তীকালে তিনি উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিলেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, এরপর তিনি আমার কাছে প্রায়ই আসতেন। আমি তার প্রয়োজনাদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর কাছে তুলে ধরতাম'।[১৭]

৬. রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমা : রাগ মানুষকে অনেক সময় সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে। তাছাড়া সমাজের মানুষ মেজাজী মানুষকে ভালোবাসে না। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমা করে দেওয়া একটা মহৎ গুণ, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

(বাকী অংশ ৩৫ নং পৃষ্ঠায়)

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৬।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৭।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩১৪৯।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৮।
১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০৪।

রাশিয়-ইউক্রেন যুদ্ধ : একটি পর্যালোচনা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

যারা মোটামুটি বর্তমান বিশ্বের খবরাখবর রাখেন তারা সকলেই জানেন যে, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ। করোনাভাইরাসের পর বর্তমান মিডিয়ায় সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু এই যুদ্ধ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইউক্রেন ও রাশিয়ার বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পেশ করা হলো।

মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ততা :

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কোনো না কোনোভাবে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত এবং মুসলিমদের ইতিহাসের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে—

(১) পৃথিবীর রাজনীতি অনেকটা তেল নির্ভর। তেল উৎপাদনকারী হিসেবে যেমন আমেরিকা ও রাশিয়া শীর্ষে আছে, ঠিক তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো শীর্ষে রয়েছে। একারণেই আমরা এই ইস্যুতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঊদী আরবে সফর আর জো বাইডেনের বারংবার সঊদী আরব এবং আরব আমিরাতের যুবরাজদের কাছে ফোনকল দেখতে পেয়েছে।

(২) পাশাপাশি গ্যাস উৎপাদনে যেমন রাশিয়া শীর্ষে, ঠিক তেমনি কাতারও অন্যতম গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ। আর ইউরোপের সাথে রাশিয়ার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে গ্যাস।

(৩) রাশিয়ার সরব উপস্থিতি আছে সিরিয়ার মাটিতে। বাশশার আল-আসাদের পক্ষে শক্ত অবস্থান রয়েছে তার। অন্যদিকে তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশের স্বার্থ রয়েছে সিরিয়াতে।

(৪) এই রাশিয়ার সাথে জড়িত আছে ককেশাস অঞ্চলের মুসলিমদের সাড়ে ৩০০-৪০০ বছরের রক্তস্নাত ইতিহাস। সুতরাং আমরা মুসলিম হিসেবে রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের এই যুদ্ধকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি না; বরং এই বিষয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করা এবং বুঝার চেষ্টা করা উচিত। সেই চিন্তাভাবনা এবং বোঝার চেষ্টা থেকেই আমাদের আজকের এই সংক্ষিপ্ত অবতারণা।

রাশিয়ার ইতিহাস :

আজকের যে রাশিয়া দাঁড়িয়ে আছে ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে, এই রাশিয়ার যদি আমরা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস টানি তাহলে নিকট অতীতে রাশিয়ার শাসনামলকে কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) জার শাসনামল : 'জার' শব্দের শাব্দিক অর্থ সম্রাট। মঙ্গোলিয়দের দখল থেকে রাশিয়াকে উদ্ধারের মাধ্যমে জার শাসনামলের শুরু হয়। জার শাসনামলের বিখ্যাত কয়েকজন শাসক হচ্ছেন— পিটার, ক্যাথরিন, আলেকজান্ডার প্রমুখ। জার শাসনামলে পরিবারকেন্দ্রিক এলিট শ্রেণির হাতে ছিল সর্বময় ক্ষমতা।

(২) বলশেভিক বিপ্লব : জার সাম্রাজ্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং জার্মানদের কাছে জার সাম্রাজ্যের পরাজয়ের কারণে রাশিয়ার জনগণ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৯১৭ সালের সেই বিদ্রোহকে বলা হয় বলশেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে লেনিন এবং জোসেফ স্ট্যালিন-এর হাত ধরে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান হয়।

(৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন : আমেরিকার সাথে স্নায়ুযুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার দাবীর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়। বিশেষ করে কম্যুনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হয়।

পুতিনের ব্রেনে দুগিন এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আদর্শিক ও ধর্মীয় কারণ :

আজকের রাশিয়াকে ভ্লাদিমির পুতিন কোন দৃষ্টিতে দেখছে এবং কোন পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুচ্ছে? কী আদর্শে এবং কী সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার অন্তরে লালন করছে? এটা জানা রাশিয়ার সামগ্রিক অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী।

যখনই আমরা বর্তমান পুতিন যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ধ্বংসস্তুপের ওপর বর্তমান রাশিয়াকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি কী ম্যানিফেস্টো ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে এগুচ্ছেন তা জানতে পারব, তখন আমাদের সামনে অনেক স্ট্রাটেজি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

পুতিন ও বর্তমান রাশিয়ার আদর্শ বুঝার ক্ষেত্রে সবার আগে যে নামটি আসবে, তা হচ্ছে দার্শনিক আলেকজান্ডার দুগিন। যার লিখিত বই-পুস্তক সেনাবাহিনীর সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি স্কুল-কলেজের সিলেবাসেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলেকজান্ডার দুগিনের যে বইটিতে বর্তমানে রাশিয়ার ম্যানিফেস্টো নামে প্রচার করা হয়, সেই বইয়ের নাম হচ্ছে 'দি ফাউন্ডেশন অফ জিওপলিটিক্স : দি জিওপলিটিক্যাল ফিউচার অফ রাশিয়া'। এই বই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হওয়ার আগেই আলেকজান্ডার দুগিন লিখেছিলেন। ২০০৫ সালে যখন আমেরিকার একটি অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন আমেরিকার গবেষকরা বলেছিলেন, আশির দশকে লেখা এই বইয়ের প্রায় পনেরোটির মতো প্রস্তাব এখন পর্যন্ত পুতিন বাস্তবায়ন করে ফেলেছে। আলেকজান্ডার দুগিন আল-জাজিরায় কিছুদিন আগে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আজকে যদি কেউ গবেষণা করে এই বই পড়ে দেখে, তাহলে দেখবে যে, পুতিন ওই বইয়ের পঞ্চাশটির অধিক প্রস্তাব এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে ফেলেছে। এজন্য আলেকজান্ডার দুগিনকে বলা হয় 'পুতিনের ব্রেন'।

আলেকজান্ডার দুগিন তার চোখের সামনে রাশিয়ায় তিন তিনটা শাসনের ধরন দেখেছেন। যেমন জার শাসনের কথা শুনেছেন, ঠিক তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব যেটাকে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র আর আরবীতে শুয়ূঈ বলা হয়— সেটার উত্থান এবং পতন দেখেছেন। পাশাপাশি বর্তমান আধুনিক বিশ্বে আজকের ইউরোপ-আমেরিকা এবং আজকের ইসরাঈল যে সেকুলার দ্বীনের ধারক ও বাহক হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দারস দেয় এবং যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সারা পৃথিবীতে প্রচার করে, সে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সেকুলারিজমও দুগিন দেখেছেন।

রাশিয়ার উত্থানের জন্য এবং রাশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য আলেকজান্ডার দুগিন কমিউনিজম, সেক্যুলারিজম ও পুঁজিবাদ থেকে বের হয়ে নতুন একটা থিউরি দিয়েছেন। এই থিউরির যদি সারমর্ম আমরা উল্লেখ করি, তাহলে আমাদের আজ থেকে ১০০০ বছর আগে ফিরে যেতে হবে। নিম্নে তার আদর্শের সারমর্ম পেশ করা হলো :

প্রথমত, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও কুরআন-হাদীছে বর্ণিত রূম। আজ থেকে হাজার বছর আগে রাশিয়াতে একজন বাদশা ছিলেন, তার নাম হচ্ছে ভ্লাদিমির। এই ভ্লাদিমিরকে রাশিয়া ও রাশিয়ার আশেপাশে যত রাষ্ট্র আছে, সবাই অনেক পবিত্র এবং অনেক মহান মনে করে। তাকে মহান মনে করার কারণে তারাও নিজেদের নামের আগে ভ্লাদিমির লাগায়। যেমন পুতিনের নিজের নামের আগেও আছে ভ্লাদিমির। সেই মহান গ্রেট ভ্লাদিমির অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করে অর্থোডক্স খ্রিষ্টান ধর্মকে সামনে রেখে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে রাশিয়াকে সংযুক্ত করে শাসনব্যবস্থা ক্বায়েম করেন। দুগিন থিউরির মূল দর্শন সেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং আমাদেরকে আগে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য কী, তা বুঝতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী, রোমান সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ইতালির রাজধানী রোমকেন্দ্রিক একটা রোমান সাম্রাজ্য। আরেকটা রোমান সাম্রাজ্য তৈরি হয় আজকের তুরস্কের ইস্তাম্বুলকেন্দ্রিক, যাকে আরবীতে কুসতুনতুনিয়া এবং ইংরেজিতে কনস্টান্টিনোপল বলা হয়। কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে যে রোমান সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে, এটাকে বলা হয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। এ দুটোর মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হচ্ছে- বাইজান্টাইনগণ অর্থোডক্স খ্রিষ্টান আর ইতালির রোমানগণ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান।

এই দুই রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি, সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ সময় টিকে থাকা এবং সবচেয়ে বেশি এলাকা শাসন করেছে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে যেখানে যেখানে 'রূম' ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বাদশা হিরাক্লিয়াস যে রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সেই অর্থোডক্স খ্রিষ্টানের রোমান সাম্রাজ্য উদ্দেশ্যে; ইতালির রাজধানী রোম উদ্দেশ্য নয়। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

আজকের আলেকজান্ডার দুগিন সেই বাইজান্টাইন শাসনব্যবস্থায় ফিরে যেতে চান। যেই রোমান এম্পায়ার অর্থোডক্স খ্রিষ্টানকেন্দ্রিক একটি ধার্মিক জাতীয়তাবাদী দেশীয় কৃষ্টি-কালচার দেশীয় সংস্কৃতিভিত্তিক গড়ে ওঠবে। এজন্য আরবী ভাষাভাষী বিশ্লেষকগণ এটাকে নব্য কায়ছার বলেছেন। আমরা জানি, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে পারস্য কিসরা ও রোমান কায়ছার ছিল। আজকের পুতিন সেই কায়ছার হতে চায়।

ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের মধ্যে অনেক বিশ্বাসগত ধর্মীয়

পার্থক্য রয়েছে, তার মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে পেশ করা হলো :

(১) বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরা সব সময়ই হিব্রু ভাষা ব্যবহার করত আর ইতালির রোমের ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা সব সময়ই ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করে।

(২) ইতালির রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরুকে বলা হয় পোপ আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরুকে বলা হয় প্যাট্রিয়ক। ছহীহ বুখারীতে হিরাক্লিয়াসের লম্বা হাদীছে بطريق বলা হয়েছে। আজকের রাশিয়ার যিনি অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের ধর্মগুরু, তাকেও প্যাট্রিয়ক নামেই সম্বোধন করা হয়।

(৩) যারা ইতালির রোমান সাম্রাজ্যের ক্যাথলিক খ্রিষ্টান তথা আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তারা বড়দিন পালন করে ২৫শে ডিসেম্বর। আর যারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্থোডক্স খ্রিষ্টান তথা আজকের অর্থোডক্স রাশিয়ার খ্রিষ্টান, তারা বড়দিন পালন করে ৭ জানুয়ারি।

(৪) অর্থোডক্সদের দাবি অনুযায়ী, যারা ক্যাথলিক খ্রিষ্টান তারা মূলত একজন ইয়াহূদী যে নিজে নামকাওয়াস্তে খ্রিষ্টান রূপ ধারণ করে খ্রিষ্টান ধর্মকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে, সেই বিকৃত ধর্মের অনুসারী। আর অর্থোডক্সরা নিজেদেরকে মূল খ্রিষ্টান ধর্মের মূল ধারার অংশ মনে করে।

(৫) বর্তমান পৃথিবীতে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান এবং অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে- অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের পরিবার প্রথা, দেশীয় কৃষ্টি-কালচার ও ধর্ম-কর্মের প্রতি বেশি আগ্রহ।

আলেকজান্ডার দুগিন সম্পূর্ণরূপে কমিউনিজম থেকে রাশিয়াকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কমিউনিজম হচ্ছে ধর্মহীনতা এবং ধর্মবিরোধিতা, সেখান থেকে দুগিনের নতুন থিউরি দিয়ে পুরো রাশিয়াকে একটা ধর্মকেন্দ্রিক দেশে পরিণত করার চেষ্টা করেছে। যেটার ভিত্তি থাকবে অর্থোডক্স খ্রিষ্টান। যেটার ভিত্তি থাকবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। পুতিনও ওই আদর্শে বিশ্বাস করে একটা ধর্মকেন্দ্রিক রাশিয়াকে গড়ে তুলছেন। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাশিয়া এবং আজকের রাশিয়ার মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য আছে। বিশ্বাসগত এবং আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে এবং নিকট অতীতে রাশিয়া যে যুদ্ধগুলো পরিচালনা করেছে তার প্রত্যেকটির পিছনে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সেই মূল ইচ্ছাটা ধরা পড়বে।

আলেকজান্ডার দুগিন তার লিখিত বইয়ে নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন যে, ক্রিমিয়া দখল করতে হবে। তিনি ইউক্রেন দখলের বিষয়েও তার বইয়ে পরামর্শ দিয়েছেন অনেক আগেই। তিনি লিখেছেন, রাশিয়ার রেনেসাঁ থামাতে পারে একমাত্র ইউক্রেন। সুতরাং ইউক্রেন ও ক্রিমিয়াকে দখল করা ছাড়া রাশিয়ার এই রেনেসাঁ পূর্ণতা পাবে না। এভাবে আশির দশকে তার উল্লেখিত বইগুলোতে আলেকজান্ডার দুগিন লিখেছেন।

দ্বিতীয়ত, দুগিনের আরও একটি বই রয়েছে 'দি ফোর্থ পলিটিকাল থিউরি' নামে। উক্ত বইয়ে তিনি তার থিউরিকে চর্তুথ পলিটিক্যাল থিউরি বলেছেন। এই থিউরির মূল ম্যানিফেস্টো হচ্ছে American liberalism must be destroyed. তথা আমেরিকার যে লিবারেজম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আছে, এটাকে যেকোনো মূল্যে ধ্বংস করতে হবে। প্রোজায়নিজম ইয়াহূদীবাদকেন্দ্রিক যে অর্থনীতির ব্যবস্থা আছে, সমগ্র পৃথিবীতে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে হবে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধূলিস্যাৎ করে দিতে হবে। তার এই থিউরির পক্ষে যুক্তি হিসেবে আলেকজান্ডার দুগিন আল-জাজিরা চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে এটাও বলেছেন, লিবারেলিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার ধোঁয়া দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানবাধিকারের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে সংখ্যালঘুদের কাছে অসহায় করে ফেলে। দুগিনের দাবি হচ্ছে, মানুষের মানবাধিকার নির্ধারিত হবে তার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে। ধর্ম থেকে আলাদা কোনো মানবাধিকার নেই। সমাজে যে কাজটা অগ্রহণযোগ্য ও অপছন্দনীয়, মানবাধিকারের নামে তাকে সেই কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে- এটার আমরা সম্পূর্ণরূপে বিরোধিতা করি। সামাজে ও ধর্মে সমকামিতা ঘৃণিত হয় এবং সমাজে যদি যেনা-ব্যভিচার ঘৃণিত হয়, তাহলে মানবাধিকারের নামে সমকামিতার সুযোগ দেওয়া হবে না। মানবাধিকারের নামে তাকে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেওয়া হবে না।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে একটি দেশকে তার নিজ দেশীয় সংস্কৃতি এবং নিজ ধর্মীয় সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করে, আমরা সেই সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে। তথা দুগিন ধর্মভিত্তিক রক্ষণশীল নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন। তার এই থিউরিগুলোর মাধ্যমে রাশিয়ার ঐক্যকে মযবূত ও শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। মানুষকে এক আদর্শের উপর একত্রিত করতে চেয়েছেন। যাতে এখন পর্যন্ত দুগিন ও পুতিন অনেকটাই সফল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ও টিসিবির লাইনে ধাক্কাধাক্কি

-জুয়েল রানা*

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পদতলে জনজীবন পিষ্ট। দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই। এর মুখে লাগাম দেওয়া যাচ্ছে না। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার কারণে দৈনন্দিন পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পরিবার প্রধানদের উঠছে নাভিশ্বাস।

চাল, ডাল, তেল, আটা থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। বাজারের উত্তাপ সইতে না পেরে মধ্যবিত্তরাও টিসিবির ট্রাকের পেছনে দাঁড়াচ্ছেন। নিত্যপণ্য পেতে সেখানেও হাহাকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অনেকে ফিরছেন খালি হাতে।

এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে নিত্যপণ্য মূল্যের অস্থিরতা সামলাতে নড়েচড়ে বসেছে সরকার।

ভোজ্যতেলের দাম বাড়ার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের কমিটিও করেছে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের কারসাজি ঠেকাতে সারা দেশে বাজারে তদারকি জোরদার করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। পণ্য বেচাকেনায় পাকা রসিদের ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। অন্তত রামাযান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি আদায়ে মানববন্ধন ও সমাবেশও করা হয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু বাজারে নিত্যপণ্যের দামে এসবের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব চোখে পড়ছে না। নিত্যপণ্যের দামে এখনো পুড়ছে প্রান্তিক ও সীমিত আয়ের মানুষ। দীর্ঘ হচ্ছে সাধারণ, সীমিত ও প্রান্তিক আয়ের মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

এর আগে পেঁয়াজ ও চাল নিয়ে বাজার অস্থির করে তুলে অল্প সময়ে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এখন সয়াবিন তেল নিয়ে শুরু হয়েছে। পেঁয়াজ ও চালের উৎপাদন সন্তোষজনক হলেও এগুলোতে বাড়তি মুনাফা করছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। বাজার ব্যবস্থাপনায় গলদসহ অসাধু ব্যবসায়ীদের অপকর্ম বন্ধে সরকারের শিথিলতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা সক্রিয় সরবরাহ সংকট ও অতি মুনাফা করে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন, যার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ ভোক্তারা। গোঁড়া থেকে সমস্যার সমাধান না করলে সরকার যতই উদ্যোগ নিক, সুফল মিলবে না।

ভোক্তা ও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া, ভ্যাট প্রত্যাহার, নিত্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এলসি (ঋণপত্র) মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখাসহ বাজার তদারকি জোরদার করছে। তবুও ভোক্তারা এর সুফল পাচ্ছেন না। বাজারে বেশি মুনাফা লুটতে এখনো তৎপর মজুদদার ও সিন্ডিকেট চক্র।

গণমাধ্যম আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শহুরে মধ্যবিত্তের দখলে। সেখানে তাদের হইচই বেশি শোনা যায়। তাদের সমস্যা নিয়েই সবার ভাবনা। মাসিক ৫০ হাজার টাকা আয়েও চার জনের মধ্যবিত্ত সংসার চলে না, এমন সংবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক মানুষগুলোর কথা আমাদের ভাবনায় খুব একটা থাকে না।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সব মানুষের ঘরেই উন্নয়নের কিছু না কিছু সুফল পৌঁছে দেওয়া। বৈষম্য কমিয়ে আনা। প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাদের দু'বেলা পেট পুরে খাওয়া নিশ্চিত করা। তখন উন্নয়ন ন্যায্য হয়, যৌক্তিক হয়, টেকসই হয়, স্বস্তি এবং আনন্দদায়ক হয়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সাধারণ ও স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনযাত্রায় কতটা প্রভাব ফেলেছে, তা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) গাড়ির সামনে দীর্ঘ লাইন দেখেই ধারণা করা যায়।

কেননা, স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বাড়ছে টিসিবির ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রে। একসময় সরকারি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রে নিম্ন আয়ের মানুষের লাইন দেখা যেত। কিন্তু এখন নিম্নবিত্তদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরাও টিসিবির লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। এ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে গণমাধ্যম আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু এর বাইরে কিছু মানুষ আছে, যারা দারিদ্র্যসীমার একদম প্রান্তে বাস করে। তাদের আসলে টিসিবির লাইনে দাঁড়ানোর সামর্থ্যও নেই। কারণ এত যে লাইন, এত যে ধাক্কাধাক্কি, এত আলোচনা, এত খবর; সেই টিসিবিও তো বিনা পয়সায় পণ্য দেয় না; ন্যায্যমূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রি করে। কিন্তু ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতেও তো টাকা লাগে নাকি!

টিসিবি সূত্রে জানা যায়, খোলা ট্রাকে পণ্য বিক্রি গত বছরের তুলনায় আড়াই গুণ বেড়েছে। টিসিবির পণ্য বিক্রি এমন জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকলে, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কেমন চলছে।

একই সঙ্গে আরেকটি নতুন বিষয় আমাদের সামনে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু সাধারণ মানুষই নয়; দোকানদার ও ব্যবসায়ীরাও তাদের লোক লাইনে দাঁড় করিয়ে পণ্য কিনছেন। কারণ টিসিবির পণ্য কিনে তারা বাজারমূল্যে

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

বিক্রি করলে অধিক লাভ করতে পারছেন। কিছুদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় 'টিসিবির চার পণ্যে সাশ্রয় ২৯০ টাকা' শিরোনামের প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বেশ কিছু চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, স্থানীয় দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা নির্ধারিত লোক লাইনে দাঁড় করিয়ে টিসিবির পণ্য কেনাচ্ছেন। এতে অনেক সাধারণ ক্রেতা বঞ্চিত হচ্ছেন। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও তাঁরা পণ্য পাচ্ছেন না।'

সমাজে বৈষম্য ছিল, আছে এবং থাকবেও। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সেই বৈষম্য কমিয়ে আনা, একটা সহনীয় সীমার মধ্যে রাখা। কিন্তু বৈষম্য যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন বুঝতে হয় সার্বিক উন্নয়ন ভাবনায় ভয়ংকর গলদ আছে।

পণ্য সরবরাহ ও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী ইসলাম বাজারব্যবস্থা ও দ্রব্যমূল্যকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে চায়। সমাজতন্ত্রের মতো বাজার প্রক্রিয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করে 'মূল্য নির্ধারণ কমিশন গঠন' করে সরকার কর্তৃক দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। বস্তুত ইসলামী অর্থনীতিতে দামকে মানবিক প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করা হয়। ইসলামী অর্থনীতির দাম নীতি বাস্তবসম্মত দাম নীতি (Pragmatic Price Policy)। স্বাভাবিক বাজার দর অনুযায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে এটাই ইসলামের কাম্য। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّيْ لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلَا مَالٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রব্যমূল্যের গতি নির্ধারণকারী, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং তিনি রিযিক্বদাতা। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই, যেন তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার জান ও মালের ব্যাপারে যুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে'।[১] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ أَدْعُوْ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّى لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, একজন লোক এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বরং আমি (আল্লাহর কাছে) দু'আ করব। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বললেস, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করুন! তখন তিনি বললেন, 'বরং আল্লাহই দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। আমি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা করি, যেন আমার বিরুদ্ধে কারও প্রতি যুলুম করার অভিযোগের সুযোগ না থাকে'।[২]

উল্লেখিত হাদীছ দু'টি থেকে বুঝা গেল যে, দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর হুকুমেই ঘটে থাকে। ইবনু কুদামা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ لَمْ يُسَعِّرْ وَقَدْ سَأَلُوْهُ ذَلِكَ وَلَوْ جَازَ لَأَجَابَهُمْ إِلَيْهِ الثَّانِيْ أَنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِ مَظْلَمَةً وَالظُّلْمُ حَرَامٌ وَلِأَنَّهُ مَالُهُ فَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهُ مِنْ بَيْعِهِ بِمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَبَايِعَانِ.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দু'দিক থেকে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ বৈধ না হওয়ার দলীল সাব্যস্ত হয়।- ১. লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের আহ্বান জানালেও তা তিনি করেননি। যদি সেটি জায়েয হতো, তাহলে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিতেন। ২. দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ না করার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, এটি যুলুম। আর যুলুম হারাম। তাছাড়া তা বিক্রেতার মাল। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতা ঐকমত্য পোষণ করলে বিক্রেতাকে তার মাল বিক্রি করা থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়'।[৩]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তবে যদি ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারসাজিতে অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে সরকারকে অবশ্যই বাজার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ لَا يَرْضَوْنَهُ أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللهُ لَهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ.

'মূল্য নির্ধারণ যদি মানুষের প্রতি যুলুম করা এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে এমন মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করাকে শামিল করে, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা থেকে শাসক নিষেধ করেন, তাহলে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ হারাম। কিন্তু মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন, বাজারের প্রচলিত দামে তাদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য করা এবং প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ করা থেকে শাসক তাদেরকে নিষেধ করেন, তাহলে তা শুধু জায়েযই

১. তিরমিযী, হা/১৩১৪; আবূ দাঊদ, হা/৩৪৫১; ইবনু মাজাহ, হা/২২০০, হাদীছ ছহীহ।

২. আবূ দাঊদ, হা/৩৪৫০, সনদ ছহীহ।

৩. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ৬/৪১২।

নয়; রবং ওয়াজিব'।[৪]

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولى الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولى الامر أن يحدد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض.

'যখন বিক্রেতারা তথা ব্যবসায়ী ও অন্যরা তাদের নিজেদের কাছে যে পণ্য আছে তার দাম তাদের ইচ্ছামতো বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবে, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের কল্যাণ করা ও ফিত্বনা-ফাসাদ দূর করার সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বিক্রেয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করবেন। আর যদি তাদের মধ্যে ঐকমত্য না হয়; বরং কোনো প্রকার প্রতারণা ছাড়াই পর্যাপ্ত চাহিদা ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ কম হওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং তিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দেবেন যে, আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক্ব দিবেন'।[৫] শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

إذا كان غلا الأسعار بسبب قلة وجود السلع قلة العرض فلا أحد له دخل؛ لكن يقال للتجار بيعوا مثل ما يبيع الناس ما تساوي في الأسواق لا تضربون بالناس، أما إذا كان غلا السعر بسبب تلاعب التجار يخزنون الأموال وتقل في الأسواق على شأن يبيعونها غالية هذا يمنع ولى الأمر، يجبرهم على أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس، هذا هو العدل.

'পণ্যের স্বল্পতা ও সরবরাহ কম হওয়ার কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে এতে কারও কিছুই করার নেই। তবে ব্যবসায়ীদেরকে বলা হবে, মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে, সে বাজারমূল্যে তোমরা বিক্রি করো। মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। পক্ষান্তরে মাল গুদামজাত করার কারণে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে পণ্যের ঘাটতি হেতু তারা বেশি দামে মাল বিক্রি করে, তাহলে শাসক এতে হস্তক্ষেপ করবেন। মানুষেরা যে দামে বিক্রি করছে, সে দামে বিক্রি করতে তিনি তাদেরকে বাধ্য করবেন। এটাই আদল বা ন্যায়নীতি'।[৬]

৪. ইবনু তায়মিয়া, আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম (কুয়েত : জামঈয়্যাতু ইহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৯-২০।

৫. ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়েমা লিল-বুহূছ আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা (সঊদী আরব : মুআসসাসাতুল আমীরাহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), ১৩/১৮৬।

৬. https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14702.

'যেমন ছিল নবীজীর চরিত্র' প্রবন্ধটির বাকী অংশ

আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়ার নামই ক্ষমা। এর সর্বোচ্চ আদর্শ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রে পাওয়া যায়।

তার একটা বড় দৃষ্টান্ত— মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন। তারা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারে তার নির্দেশেরই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সীরাত অধ্যায়ের যে বিখ্যাত বাক্যটি বলেছিলেন সেটি ছিল, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَا تَرَوْنَ أَنِّى فَاعِلٌ بِكُمْ؟ 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের ব্যাপারে কী আচরণ করব বলে তোমরা ধারণা পোষণ কর? তারা জবাবে বলল, قَالُوا خَيْرًا أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ 'উত্তম ধারণা রাখি। আপনি আমাদের মহানুভব এক ভাই। মহানুভব এক ভাইপো'। তখন তিনি বললেন, اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ 'যাও, তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ দায়মুক্ত!' *(ইবনে হিশাম, সীরাতুন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৪/৬৮)*।

মক্কা বিজয়ের আগে কুরাইশরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অত্যাচার-নির্যাতন, তিরস্কার, সামাজিকভাবে বয়কট করা এমনকি হত্যার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। চাইলে তিনি এক এক করে প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনিই হলেন প্রিয় নবী, দয়ার নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এগুলো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কয়েকটি দিক মাত্র, যা আমাদের ব্যক্তি জীবনে বা সামাজিক জীবনে বেশি ফুটে উঠে। যেহেতু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য মডেল তথা আদর্শ, সেহেতু আমাদের উপর অপরিহার্য সেই মডেলকে সামনে রেখে নিজের চরিত্র গঠন করা। যাতে করে আমাদের মালিক আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন। অতএব, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে নিজেদের চরিত্র ও স্বভাবকে সমাজের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

রামাযান শেষে...

*-জাবির হোসেন**

রামাযান মাস শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ হলো। আফতাব সাহেব বিকেলবেলা বাজারে এসেছিলেন। ফেরার পথে, হঠাৎ ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল। আবহাওয়া যে এরকম হতে পারে, তিনি আগে আঁচ করতে পারেননি। তাহলে সঙ্গে করে বর্ষাতিটা নিয়ে আসতেন। উপায় নেই দেখে, তিনি জোরে মোটরবাইকটি চালাতে লাগলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো। আকাশে বিদ্যুতের চমকানি। মেঘের গর্জনে কান পাতা দায়। অগত্যায় আফতাব সাহেব মোটরবাইকটিকে পাকা রাস্তার উপরে রেখে, সামনে একটি মাটির বাড়ির খড়ের ছাউনির বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা মুছতে মুছতে রাস্তার দিকে চোখ মেলে চাইলেন। দেখলেন, অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। সামনের ইলেকট্রিক তারে দুটি কাক বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। বজ্র বিদ্যুতের ঝলমলে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় তার।

মাথা মুছতে মুছতে আফতাব সাহেব দেখলেন, তার মতো আরও একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

'আরে আফতাব, কোথায় গিয়েছিলি?'— জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'আরমান— তুই। কী ব্যাপার! বাজারে গিয়েছিলাম'। —জবাব দিলেন আফতাব সাহেব।

'আমিও বাজারে গিয়েছিলাম। এইতো বৃষ্টিতে আটকে গেছি'। —আরমান বলল।

আফতাব আর আরমান দুই বন্ধু। সেই ছোটবেলা থেকে। একই গ্রামে বাস। সাংসারিক জীবনে এসে যদিও আগের মতো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, তবুও মাঝেমধ্যে হয়। আফতাব প্র্যাক্টিসিং মুসলিম। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। আরমান এর বিপরীত। নিয়মিত ছালাত আদায় করে না। শুধু জুমআর ছালাত, জানাযার ছালাত আর দুই ঈদের ছালাত আদায় করে। গতানুগতিক মুসলিমরা যা করে— তাই আর কী!

বৃষ্টিভেজা বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু নানারকম গল্প করে। তাদের সাংসারিক জীবনের গল্প, রাজনীতির গল্প, মোড়ল-মাতব্বরদের গল্প— বাদ যায় না কোনো কিছু। এক সময় আফতাব বলে, 'কী ব্যাপার আর তোকে মাসজিদে দেখতে পাচ্ছি না যে!'

আরমান এই রামাযানে ছালাত শুরু করেছিল। এক মাস পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মাসজিদে এসে জামাআতের সাথে আদায় করেছে। ৩০ দিন ছিয়াম পালনও করেছে। কিন্তু ঈদের ছালাতের পরদিন থেকে আর মসজিদমুখো হয়নি।

আফতাবের জিজ্ঞাসার জবাবে সে আমতা আমতা করে বলল, 'না মানে, ইয়ে...!'

আফতাব বলল, 'কত সুন্দর দেখাচ্ছিল, তুই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামাআতে পড়ছিলি। —এমন কী তুই, আমার আগেও জামাআতে এসে হাযির হচ্ছিলি। কিন্তু ঈদের পর হঠাৎ তোর কী হলো বল তো?'

'আমাদের তো ছালাত আদায় করা উচিত। কিন্তু সময়...' — ঢোক গিলে আরমান বলল।

আরমানের কথা শেষ হবার আগেই আফতাব বলল, 'এগুলো তোর অজুহাত মাত্র। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টা সময় বের করা কোনো ব্যাপারই নয়। যারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের মুছল্লী, তারা কত কাজের মধ্য হতেও ছালাতের জন্য ঠিকই সময় বের করছে। আর তুই...!'

আফতাব পুনরায় বলতে লাগল, 'শোন, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? —আচ্ছা বলত, তুই এই এক মাস কেন ছালাত-ছিয়াম আদায় করলি?'

'আল্লাহর জন্য। তিনি আমাদেরকে এই ইবাদতগুলো করতে বলেছেন— তাই'। —আরমানের চটপট জবাব।

আফতাব বলল, 'যে আল্লাহর জন্য এই এক মাস কষ্ট করে এই ইবাদত পালন করেছিস, সেই আল্লাহ কি সারা বছর ইবাদত পালনের নির্দেশ দেননি? —আচ্ছা, তুই বলত, ছিয়াম কেন ফরয করা হয়েছে?'

আরমান উত্তর দিতে সংকোচবোধ করছে দেখে আফতাব তাকে বলল, 'ভাই! গুগলে সূরা আল-বাক্বারার ১৮৩ নম্বর আয়াত সার্চ দে। তারপর আমাকে পড়ে শোনা'।

আরমান নিজের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনটি পকেট থেকে বের করে, গুগলে সার্চ দিয়ে সশব্দে আয়াতটি পড়তে লাগল, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ফরয করা হলো, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার'।

আফতাব বলল, 'রামাযানের ছিয়াম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো— তাক্বওয়া অর্জন। এখন প্রশ্ন হলো, তাক্বওয়া কী?

—সাধারণ অর্থে আল্লাহভীতিকে তাক্বওয়া বলা হয়। তাক্বওয়া হচ্ছে হারাম কাজ পরিত্যাগ করার নাম। ব্যাপক অর্থে, তাক্বওয়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় বাস্তবায়ন করা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা।

—এই এক মাস ছিয়াম রেখে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে। মিথ্যা কথা, ঝগড়াঝাঁটি, গান-বাজনা ইত্যাদি থেকে বাঁচতে। প্রচণ্ড তেষ্টায় গলা ফেটে

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

যাচ্ছে, তবুও আমরা একফোঁটা পানি পান করিনি। লুকিয়ে পান করলে কেউ দেখতে পেত না। কিন্তু আমরা তা করিনি— কারণ, মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়া যায় না।

—রামাযানে এভাবেই আমাদের তাক্বওয়া অর্জিন হয়। আর রামাযানের অর্জিত তাক্বওয়ার প্রতিফলন আমাদেরকে সারা বছর ধরে রাখতে হয়'।

একটু থেমে আফতাব আবার বলতে লাগল, 'শুনেছি তোর ছেলে ডিফেন্সে চান্স পেয়েছে?'

'হ্যাঁ। এই কদিন তো হলো। এখন ট্রেনিং চলছে'। — আরমান বলল।

আফতাব বলল, কোনো ব্যক্তি আর্মিতে জয়েন করার পর, একটি নির্দিষ্ট সময় ট্রেনিং পিরিয়ডে যোগদান করতে হয়। সেখানে তাকে সময়ানুবর্তিতা, নেতার আনুগত্য, অস্ত্রচালনা, শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার কৌশল, নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করার নানান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেমন তোর ছেলে এখন ট্রেনিং পিরিয়ডে আছে। ট্রেনিং শেষ করে, তারপর পোস্টিং পাবে।

—এখন এইরকম কোনো ট্রেনিংপ্রাপ্ত আর্মি, যদি দেশের বর্ডারে পোস্টিং পেয়ে, শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, মদ, গাঁজা, গানবাজনা আর জুয়ার আড্ডায় মেতে থাকে এবং শত্রুপক্ষের গুলির বিরুদ্ধে নিজের অস্ত্র প্রয়োগ না করে যদি মারা যায়, তাহলে তাকে কী বলা হবে?'

আরমান বলল, 'বেওকূফ'।

'হ্যাঁ, তাকে বেওকূফই বলা হবে'। —আফতাব আরমানের কথাতে সমর্থন দিয়ে পুনরায় বলতে লাগল, 'সরকার তাকে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করতে। যদি সে সঠিকভাবে তা প্রয়োগ করে মারা যেত, তাহলে তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হতো। আর যদি বিজয়ী হতো, তাহলে সে গাজীর মর্যাদা পেত। সে কখনো ব্যর্থ নয়, তাঁর বাঁচা ও মরা উভয়ই মর্যাদার।

অনুরূপ স্রষ্টার ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য রামাযান মাস হলো আমাদের জন্য ট্রেনিং পিরিয়ড। এই পিরিয়ডে আমাদের শত্রু শয়তানকে বন্দি রেখে তার বিরুদ্ধে কীভাবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে, তার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা না খেয়ে ও যৌনকর্ম থেকে বিরত থেকে সংযমের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতে ১১ মাস শয়তানের হাজারো প্রলোভনে সে কখনোই প্রতারিত হবে না। শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করা তাঁর জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে। সে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করতেই থাকবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে।

শয়তানকে প্রতিহত করার মোক্ষম অস্ত্র হলো— তাক্বওয়া। যেটা ছিয়াম পালনে অর্জিত হয়। যার হৃদয়ে তাক্বওয়া যত বেশি, তাঁর আখলাক, আমল তত বেশি স্বচ্ছ। যার হৃদয় তাক্বওয়াশূন্য— তার হৃদয় শয়তানের ঘাঁটি। সুতরাং যে অস্ত্র দ্বারা শয়তানকে প্রতিহত করা যাবে, সেই শিক্ষা যেহেতু রামাযান মাসে অর্জিত, তাই বাকি ১১ মাস সতর্ক থেকে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে নিজেকে ডিফেন্স করতে হবে। এই তাক্বওয়া শিক্ষার প্রতিফলন নিজেদের জীবনে আনতে হবে।

ইবাদত নিরবচ্ছিন্ন। মহান আল্লাহর ঘোষণা, 'মৃত্যু আসা অবধি তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকো' *(আল-হিজর, ১৫/৯৯)*।

আফতাব একটু থেমে আরমানের পিঠে হালকা থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'তোকে যে আল্লাহ রামাযান মাসে নির্দেশ দিয়েছিল, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় ও এক মাস ছিয়াম পালন করার, সেই আল্লাহ সারা বছরই তাঁর ইবাদতে অভ্যস্ত হতে বলেছেন। বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তার ইবাদত করতে। তাহলে রামাযান বিদায় নিয়েছে বলে তুই ইবাদতে অলসতা করছিস কেন? রামাযানে এত কষ্ট করে ছালাত-ছিয়াম পালন করে, এখন...!'

আফতাবের কথা শেষ হবার আগেই আরমান আফসোসের সুরে ভাবতে লাগল, হ্যাঁ— সত্যিই, এত কষ্ট করে আমি ছিয়াম পালন করলাম। ছালাত আদায় করলাম। অথচ ঈদের পরেই আবার আমি আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি! আমি ইবাদতে উদাসীন হয়ে পড়ছি! ঠিক যেমন মনে হচ্ছে, কষ্ট করে আগুনের কাছে থেকে রান্না করে, সেই রান্না না খেয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। তাহলে কী লাভ হলো রান্না করে! কী লাভ হলো এত কষ্ট করে! না, না! এভাবে শয়তানকে সুযোগ দিলে হবে না! আমার অন্যায় হচ্ছে! আমি চেষ্টা করব মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করার। না জানি, কবে মৃত্যু এসে যায়। পরবর্তী রামাযান ভাগ্যে জুটবে কিনা কে জানে। রামাযানের কয়েকদিন আগে তার বন্ধু শামীমের কথা মনে পড়ে। একসাথে কত হাসি-ঠাট্টা, আড্ডা-ইয়ার্কি করেছে। কিন্তু আজ সে কবরে। রেকলেস ড্রাইভিং করতে গিয়ে এন.এইচ-৩৪ রোডে বাইক অ্যাক্সিডেন্টে স্পটে মারা যায় সে। ছালাত পড়ব পড়ব করেও তার আর ছালাত পড়া হলো না।

ভাবতে ভাবতে চোখে পানি চলে আসে আরমানের। হায়রে দুনিয়া! মরে গেলে কেউ তো আর মনে রাখবে না। একে একে সবাই ভুলে যাবে আমাকে। কিন্তু কবরের জীবনে একাকী থাকতে হবে আমাকে। তখন...!

ছলছল চোখে আরমান আফতাবকে জানাই, 'ভাই, তুই ঠিকই বলেছিস। রামাযানের শিক্ষা সারা বছর ধরে রাখতে হবে আমাদের। ইনশাআল্লাহ, আমি আর ছালাত ছাড়ব না। দু'আ কর আমার জন্য।

বৃষ্টি থেমে গেছে। দুই বন্ধু বারান্দা থেকে নেমে নিজ যানবাহনের কাছে এগিয়ে যায়। আরমান মোটরবাইকটি স্টার্ট দিয়ে আগে চলে যায়।

আরমানের চলে যাওয়ার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকে আফতাব। আরমানের চোখে-মুখে আবেগের ছাপ স্পষ্ট বুঝতে পারে সে। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে, 'আল্লাহ গো, তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দান করো'।

মনীষী পরিচিতি-৩ : আল্লামা উবায়দুল্লাহ খান আফীফ রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : ইসলাম ও মুসলিমের খেদমতে যারা নিরলস জীবনযাপন করে গেছেন, যারা নিভৃতে কাজ করে গেছেন, তাদের মধ্যে পাকিস্তানের মুফতী উবায়দুল্লাহ খান আফীফ রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত সাদাসিধা পরনের ও গড়নের এই বিশিষ্ট আলেম কখনই নিজেকে প্রচার করতেন না। যার ফলে তার ব্যাপারে আমাদের বাঙালি সমাজ মোটেও ওয়াকিবহাল নন। আজকে তার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা পেশ করা হলো—

জন্ম : শায়খ উবায়দুল্লাহ খান আফীফ পূর্ব পাঞ্জাবের ফীরোযপুর জেলার কাট্টি বালুচাঁ নামক গ্রামে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ। যিনি হানাফী থেকে আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

পড়াশোনা : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তার পড়াশোনার সূচনা হয়। তিনি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। সেসময় প্রথম হতে ষষ্ঠ শ্রেণিকে 'নিম্ন মাধ্যমিক' বলা হতো। দরিদ্রতার কারণে তাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। এরপর তিনি মাদরাসায় দ্বীনী ইলম হাছিল শুরু করেন। সেকাল ও একালের মাদরাসাগুলো সর্বদা দরিদ্র জনগণের জন্য শিক্ষার উন্মুক্ত দ্বার হিসেবে অবদান রেখে আসছে। তারপরও এক শ্রেণির মানুষ মাদরাসা শিক্ষাকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বদা আন্দোলন করতে থাকেন।

মুফতী উবায়দুল্লাহ খান আফীফ মাদরাসা নাযীরিয়া মিয়াঁ চুন্নু, মাদরাসা খাদেমুল কুরআন ওয়াল হাদীছ এবং ফায়সালাবাদস্থ জামি'আহ সালাফিয়্যাহতে দ্বীনী ইলম হাছিল করেন। জামি'আহ সালাফিয়্যাহতে তিনি যে সময় ভর্তি হয়েছিলেন যে সময় কেবল মাদরাসা নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। সে সময় মাদরাসায় মাত্র কয়েকটি ঘর ছিল। যেগুলোর কোনো দরজা-জানালা ছিল না। বিদ্যুৎ তো ছিলই না। সন্ধ্যার পর এমন অন্ধকারে ছেয়ে যেত যে, তিনি না খেয়ে শুয়ে রাত পার করে দিতেন। আহা! কতই না কষ্ট করেছেন তিনি! মাদরাসার পড়াশোনা শেষ করার পাশাপাশি তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষায় ফাযেল ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি বেফাকুল মাদারিস সালাফিয়্যাহ তথা সালাফী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি পরীক্ষাতে তিনি প্রথম হতেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

কর্মজীবন : (১) ১৯৬১ সালে ফায়সালাবাদে অবস্থিত দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ মাদরাসাতে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। শুরুতেই তিনি মিশকাত, নাসাঈ, আরবী সাহিত্যের বই মুতানাব্বীসহ একাধিক শাস্ত্রের বৃহৎ ও জটিল গ্রন্থসমূহ সফলতার সাথে পড়াতে থাকেন। এ মাদরাসায় তিনি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পাঠদান করেন। (২) ১৯৬৯ সালে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়েখ আব্দুল খালেক কুদ্দূসী রাহিমাহুল্লাহ-এর আহ্বানে তিনি লাহোরে অবস্থিত সুপ্রাচীন আহলেহাদীছ মসজিদ 'চিনাওয়ালী মসজিদ'-এর মাদরাসায় আসেন এবং এখানে তিনি দুই বছর অবস্থান করেন। ১৯৭১ সালে তিনি এখানে ছহীহ বুখারীর দারসের গোড়াপত্তন করেন। (৩) ১৯৭১ সালে তিনি উকাড়ার মাদরাসা দারুল হাদীছ-এ চলে যান। সেখানে তিনি এক বছর পাঠদান করেন। (৪) ১৯৭২ সালে চিনাওয়ালী মসজিদের সেক্রেটারির দাওয়াতে তিনি আবার উক্ত মসজিদের মাদরাসায় এসে দারস শুরু করেন। (৫) ১৯৭৮ সালে তিনি মুলতানের দারুল হাদীছ মুহাম্মাদিয়া মাদরাসামুখী হন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি বাইক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে স্বীয় কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা পান। ফলে তার বাম কাঁধ একেবারে অবশ হয়ে যায়। আরও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে এর চার দিন পর। তিনি আবারও সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে ডান হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছাত্রদেরকে পড়াতেন। অতঃপর আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর রাহিমাহুল্লাহ লাহোরে একটি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দেন এবং দক্ষ চিকিৎসক নিয়োগ করে নিজ খরচে চিকিৎসা সেবা দিতে থাকেন। ফলে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন। (৬) হাঁটাচলার মতো অবস্থা ফিরে এলে তিনি তৃতীয়বারের মতো চিনাওয়ালী মসজিদের মাদরাসায় দারস দেওয়া শুরু করেন। এটি ১৯৭৯ সালের কথা। তিনি এখানে একাধারে ১৩ বছর পাঠদান করেন। এরপর সঊদী গ্রান্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ-এর আদেশে তাকে 'সঊদী মাবঊস' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমৃত্যু তিনি এই পদে আসীন থাকার পাশাপাশি হাদীছের দারস জারী রাখেন। তিনি ৫০ বছরেরও অধিককাল যাবৎ ছহীহ বুখারীর দারস দিয়েছেন। এই বিশেষ নেয়ামত আল্লাহ সবার ভাগ্যে রাখেন না।

খুৎবা প্রদান : তিনি সারা জীবনে কতগুলো মসজিদে খুৎবা প্রদান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শ্রোতা তার বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। একইসাথে ইলমী আলোচনা ও শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে পারায় তার জুড়ি ছিল না। আসলে তিনি একজন

অনেক বড় মাপের বক্তা ছিলেন।

রচনাবলি : তিনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন— (১) ফাতাওয়া আলমগীরী পার য়েক নাযার। (২) আহকামে জানাযা। (৩) ফাতাওয়া আহলেহাদীছ (তিন খণ্ডে)। (৪) আল-আজবিবাতুছ ছহীহা ফী তারদীদি মাযহাবিশ শীআ। (৫) ফাতাওয়া মুহাম্মাদিয়া ইত্যাদি।

মৃত্যু : অসংখ্য-অগণিত আলেমের উস্তাদ এই মনীষী ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে দুনিয়ার বন্ধন ত্যাগ করে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে চলে যান। আল্লাহ শায়খের উপর রহম করুন। তার কবরকে জান্নাতের নেয়ামতে পূর্ণ করে দিন। তার ইলম দ্বারা জাতিকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, আল্লামা উবায়দুল্লাহ খান আফীফ রহিমাহুল্লাহ বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন। দ্বীনী ইলম হাছিল করতে গিয়ে তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এছাড়া দ্বীন প্রচারের স্বার্থেও তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন!

তথ্যসূত্র :

১. ফাতাওয়া মুহাম্মাদিয়া, পৃ. ৩১-৫৯, তাফসীর আহসানুল বায়ান-এর লেখক আল্লামা ছালাহুদ্দীন ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ এবং পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম শায়েখ মুফতী মুবাশশির আহমাদ রব্বানী রহিমাহুল্লাহ-এর লেখনী থেকে গৃহীত।
২. উইকিপিডিয়া,
(লিংক : wikipedia.org/wiki/ابتسى_محمد_عبيدالله_خان_عفيف)।
৩. রোযানাহ পাকিস্তান (লিংক : https://dailypakistan.com.pk/09-Feb-2022/1401122)।
৪. বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলেম শায়েখ ইসহাক ভাট্টি রহিমাহুল্লাহ, দাবিস্তানে হাদীছ, পৃ. ৫৩০-৫৩৭।

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ-এর বাকী অংশ

আরও একজন লোক কাঁদছিল। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমার একটি দিন ছুটে গেছে, তাতে আমি ছিয়াম পালন করতে পারিনি এবং একটি রাত চলে গেছে যাতে আমি নফল ছালাত আদায় করিনি, তাই কাঁদছি।

জেনে রাখো বৎস! দিন মূলত কয়েক মুহূর্তের নাম। আর মুহূর্ত কতক নিঃশ্বাসের নাম। আর প্রতিটি নিঃশ্বাস এক একটি ধনভাণ্ডার। অতএব সতর্ক থাকো, একটি নিঃশ্বাসও যেন অযথা নষ্ট না হয়ে যায়। অন্যথা ক্বিয়ামতের দিন (আমলের) শূন্য ভাণ্ডার দেখে পস্তাবে।

একজন লোক আমের ইবনু আবদে ক্বায়েসকে বলেছিল, ভাই! একটু দাঁড়ান তো, কিছু কথা আছে আপনার সাথে। তিনি তাকে বললেন, সূর্যকে থামাও দেখি। কিছু লোক মা'রূফ রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে বসেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের কি উঠার ইচ্ছা নেই? দেখো না, সূর্যের ফেরেশতা সূর্যকে বিরতিহীনভাবে টেনে চলেছে। হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ 'আমি মহান আল্লাহর প্রশংসাসহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাহলে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হয়' *(তিরমিযী, হা/৩৪৬৪; ইবনু হিব্বান, ৮২৬; ছহীহ তারগীব, হা/১৫৩৯)*।

ভেবে দেখো বৎস! সময় অপচয়কারীর কত খেজুর গাছ তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে! আমাদের পূর্বসূরীগণ প্রতিটি মূহূর্তকে গনীমত মনে করতেন। কাহমাস রহিমাহুল্লাহ দিন-রাতে তিন বার করে কুরআন খতম করতেন। পূর্বসূরীদের মধ্যে এমন ৪০ জন লোক ছিলেন, যারা এশার ওযূতে ফজরের ছালাত আদায় করতেন। রাবেয়া আল-আদাবিয়্যাহ নামক মহিলা সারা রাত জেগে থাকতেন। ফজর উদয় হলে হালকা ঘুমিয়ে নিতেন। অতঃপর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বলতেন, 'কবরের ঘুম তো অনেক দীর্ঘ'।

উপদেশ-৫ : কীসের বিনিময়ে কিনবে অনন্তকালের জীবন?

কেউ যদি তার জন্মের পূর্বের দুনিয়ার কথা চিন্তা করে, তাহলে দেখতে পাবে সেই সময়টা ছিল অনেক লম্বা। আবার তার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরের সময়টার কথা চিন্তা করলে দেখতে পাবে সেই সময়টাও অনেক লম্বা। আরও এটাও বুঝবে যে, কবরে বসবাসের সময় হবে অনেক দীর্ঘ। আর ক্বিয়ামত দিবসের কথা চিন্তা করলে জানতে পারবে— দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। আবার জান্নাত কিংবা জাহান্নামে বসবাসের সময়টা চিন্তা করলে জানতে পারবে তা হবে অনন্ত-অসীম। এরপর যদি সে তার দুনিয়ায় অবস্থানের সময়টুকুর কথা চিন্তা করে (ধরে নিলাম মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছর), তাহলে দেখতে পারে তার পুরো বয়সের মধ্যে ৩০ বছর ঘুমিয়ে পার হয়ে গেছে। ১৫ বছর কেটে গেছে শৈশবে। বাকি বয়সটুকুর হিসাব মেলালে দেখা যাবে এর অধিকাংশই কেটেছে খায়-দায়, আনন্দ-ফুর্তি ও উপার্জনে। আখেরাতের অংশটুকু পৃথক করে দেখা গেল— তার অধিকাংশতেই রয়েছে লৌকিকতা ও অলসতা। তাহলে কীসের বিনিময়ে কিনবে অনন্তকালের জীবন? তার বিনিময় কি মাত্র এই কিছু সময়? *(চলবে)*

প্রার্থনা

-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ
ছাত্রী, মাহাদ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

প্রভু! পাপ করেছি, ভুল করেছি, ক্ষমা করো মোরে,
গফূরুর রহীম তুমি, এসেছি তব দ্বারে।
দুনিয়ার চাকচিক্য করেছে মোরে গ্রাস,
পানাহ চাই দুনিয়া থেকে, করো না মোরে নিরাশ।
প্রভু! অন্তরে দাও তাক্বওয়া মোর, দাও মরণের ভয়,
পরবর্তী জীবনে যেন হতে পারে জয়।
প্রভু! চাই না আমি দুনিয়া, দিও ঈমান মোরে,
বাকি সব চাওয়া মোর রেখো গচ্ছিত করে।
দিও মোরে পরপারে করিও সম্মানিত,
সহজ করিও হিসাব মোর, বাঁধা আছে যত।
জান্নাতী করিও প্রভু মোরে পরপারে,
রহীম-রহমান তুমি, এসেছি তব দ্বারে।

খোকাখুকুর ঈদ

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

ঈদ এসেছে চাঁদ হেসেছে
নীল আকাশের গাঁয়ে,
খোকাখুকু বেজায় খুশি
নতুন জামা গায়ে।
ঈদ এসেছে ধান পেকেছে
ব্যস্ত চাষি কাজে,
খুশির নদে বান ডেকেছে
খোকাখুকুর মাঝে।
ঈদ এসেছে এই করোনা
মিছিল লাশে লাশে,
খোকাখুকুর চোখে তবু
আনন্দটাই ভাসে।
ঈদ এসেছে হাসিখুশি
ভালোবাসার টানে,
খোকাখুকুর কচিমনে
করোনা কি জানে?

ঈদ এসেছে

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
আলিম ২য় বর্ষ, সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা,
মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

ঈদ এসেছে বছর ঘুরে
হাসি-খুশি-সুখ নিয়ে,
খুশির ঝিলিক উপচে পড়ে
দেখো সবার মুখ দিয়ে।
মন খুলে সব গাইছে আজই
ঈদের খুশির মিষ্টি গান,
ছিয়াম শেষে ঈদটা এসে
ভরিয়ে দেয় সবার প্রাণ।
ফিরনি-পায়েস লাচ্ছি সেমাই
খাচ্ছে সবাই ঘর মাঝে,
ঈদের খুশির রং দিয়ে আজ
সবার শরীর মন সাজে।
ঈদের খুশির ভাগটা করো
গরীব-দুখীর সাথে আজ,
একটু খুশি দাও ছড়িয়ে
হাসি ফোটাও সবার মাঝ।

পরাস্ত বিবেক

-মো. জহুরুল ইসলাম
হরিপুর, পোরশা, নওগাঁ।

ন্যায়ের পথে সমাজ বাধা
বাধা নিজের নফসও,
বিবেক শুধু একাই লড়ে
করে চলে যুদ্ধ।
সমাজের চাপ নফসেরও চাপ
রিযিক্বের চাপ আরও,
চাপে চাপে বিবেক লয়ে
পরাজয় হয় তারও।
পরাস্ত বিবেক ক্লান্ত তাই
পাপে সমাজ ভরা,
ভারসাম্যহীন কর্মে গোটা
সমাজ দিশেহারা।

বাংলাদেশ সংবাদ

বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার

সারা বিশ্বে বর্তমানে ৪৬ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এর মধ্যে বাংলাদেশে আক্রান্ত ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা ৮৬ লাখেরও বেশি। সেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ আবিষ্কারের দাবি করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. মধু এস মালো ও জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খানের নেতৃত্বে এক দল গবেষক। বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গত পাঁচ বছর ধরে ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সী ৫৭৪ জন সুস্থ লোকের ওপর এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য, গত কয়েক দশক ধরে অন্যান্য গবেষকরা প্রমাণ করেছেন, ডায়াবেটিসের প্রত্যক্ষ কারণ হলো টক্সিন-নিয়ন্ত্রিত নিম্ন গ্রেডের সিস্টেমিক প্রদাহ। যার ফলে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ইনসুলিনের উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা কমে যায় এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস হয়। মধু এস মালো জানান, মানবদেহের অন্ত্রে থাকা মৃত ব্যাকটেরিয়ার কোষ-প্রাচীরের অংশ টক্সিন (এডোটক্সিন) হিসেবে কাজ করে। এই টক্সিন সাধারণত মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তবে উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার, ফ্রুকটোজ বা অ্যালকোহল টক্সিনকে রক্তে ঢুকতে সহায়তা করে। এর ফলে নিম্ন গ্রেডের সিসটেমিক প্রদাহের সৃষ্টি হয়। যার ফলে ডায়াবেটিস হতে পারে। তিনি জানান, মানবদেহের অন্ত্রে থাকা ইন্টেস্টিনাইল আলকালাইন ফসফেটাস নামক এনজাইম এই টক্সিনকে ধ্বংস করে দেয়। এ এনজাইমের ঘাটতি হলে অন্ত্রে অতিরিক্ত টক্সিন জমা হয়। এই টক্সিন রক্তে ঢুকে সিসটেমিক প্রদাহ সৃষ্টি করে। এর ফলে একদিকে যেমন ডায়াবেটিস হতে পারে, তেমনি ইশকেমিক হার্ট ডিজিজও হতে পারে (কেননা ইশকেমিক হার্ট ডিজিজেরও অন্যতম কারণ সিসটেমিক প্রদাহ)। বলা হয়ে থাকে যে, মোটা হলেই ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। কিন্তু মূলত ডায়াবেটিসের সঙ্গে মোটা হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। যাদের আইএপি (IAP) লেভেল বেশি, তাদের ঝুঁকি কম। আবার যাদের আইএপি কম, তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি। দেহে আইএপি কম হলে হার্ট ডিজিজও হতে পারে। কোলেস্টেরল বেড়ে যায়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান কারণই হলো আইএপি লেভেল বেড়ে যাওয়া। এছাড়াও মুটিয়ে যাওয়া, শারীরিক অ্যাক্টিভিটি কমে যাওয়া, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট হওয়া অন্যতম। দেশে ১৫ শতাংশ ডায়াবেটিস হয়ে থাকে জেনেটিক কারণে। যেগুলো রোধে আমাদের কিছুই করার নেই। তবে বাকি ৮৫ শতাংশই আইএপি সংক্রান্ত কারণে হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, যাদের শরীরে এ এনজাইম বেশি থাকে তাদের তুলনায় যাদের কম থাকে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার হার ১৩ দশমিক ৮ গুণ বেশি। অল্পবয়সীদের যাদের অন্ত্রে এ এনজাইমটি দ্রুত কমতে থাকে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি ৭ দশমিক ৩ গুণ বেশি। যাদের অন্ত্রে এ এনজাইমটি কম ছিল এবং পরে বেড়েছে তাদের ডায়াবেটিস হয়নি। এনজাইমটি যাদের অন্ত্রে কম ছিল তাদের ফাস্টিং সুগার বৃদ্ধির মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ। এনজাইমের মাত্রা বেশি হলে স্থূল ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস হয় না।

টানা ৪ বছর দূষিত দেশের তালিকায় প্রথম বাংলাদেশ

টানা ৪ বছর বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশের তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশ। বায়ুদূষণ এবং বায়ু পরিশোধন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা সুইস সংস্থা কিউএয়ারের (QAir) সদ্য প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য ওঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বাতাসের মান বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয়ে দূষিত ৫০ শহরের মধ্যে ৪৬টিই এই অঞ্চলে অবস্থিত। এ প্রতিবেদনটি বাতাসের মধ্যে পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ (PM2.5) নামে পরিচিত এক ধরনের পার্টিকেল বা সূক্ষ্ম কণার উপস্থিতি হিসেব করে তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পিএম টু পয়েন্ট ফাইভের গড় বার্ষিক মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। আর ২০২১ সালে বাংলাদেশের প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে পিএম টু পয়েন্ট ফাইভের গড় মাত্রা ছিল ৭৬.৯ মাইক্রোগ্রাম। দূষিত দেশের তালিকায় পাকিস্তান ও ভারতের অবস্থান যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম। আর শহরের বিবেচনায় বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ বায়ুর মানের তালিকায় আবারও শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নাম। ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (AQI) মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩২। এছাড়া ২১৯ ও ১৮৩ স্কোর নিয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে চীনের বেইজিং ও পাকিস্তানের লাহোর। একিউআই স্কোর ১০১ থেকে ২০০ হলে সেটিকে 'খারাপ' বলে গণ্য করা হয়। সেখানে ঢাকার একিউআই স্কোর ২৩২। একইভাবে ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে 'খুব খারাপ' বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১ থেকে ৪০০ এর স্কোর 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়। আর ঝুঁকিপূর্ণ একিউআই স্কোর বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

এশিয়ায় চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেড়েছে

মহামারি করোনার ধাক্কায় ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মানব উন্নয়নে নিম্নমুখী হয়েছে বিশ্ব। ম্যানিলাভিত্তিক সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) এক প্রতিবেদনে বলা

হয়েছে, মহামারি করোনাভাইরাসের ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (আগের এশিয়া অঞ্চল) দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে। ধনী-গরীব বৈষম্য আরও বেড়েছে। মহামারির কারণে ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মানব উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী হ্রাস পেয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ৯ কোটি লোককে চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ৩২ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, যাদের প্রতিদিনের আয় ১ দশমিক ৯০ ডলারের (বর্তমানে প্রতি ডলার ৮৬ টাকা হিসাবে ১৬৩ টাকা) কম তাদেরকে চরম দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আর যাদের দিনে উপার্জন ৩ দশমিক ২০ থেকে ৫ দশমিক ৫০ ডলার তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে বলে ধরা হয়। করোনা মহামারিতে উন্নয়নশীল এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১০ কোটি ৯০ লাখ থেকে বেড়ে ১৬ কোটি ৭০ লাখ হয়েছে, যা বিশ্বের মোট বেকারের ৭০ শতাংশ। মজুরি আয়ের ক্ষতি হয়েছে ৩৪৮ বিলিয়ন থেকে ৫৩৩ বিলিয়ন ডলার।

মুসলিম বিশ্ব

ইসলাম গ্রহণ করলেন ঘানার ফুটবলার থমাস পার্টি ও ডাচ ফুটবল কিংবদন্তি ক্ল্যারেন্স সিডর্ফ

আর্সেনাল ক্লাবের হয়ে খেলা ঘানার ফুটবলার থমাস পার্টি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের আগে অনেক দিন যাবত তিনি লন্ডনে ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করেন। থমাস পার্টি ১৯৯৩ সালে ঘানায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০২০ সালে তিনি ৪৫ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে আর্সেনালে যোগ দেন। এর আগে তিনি অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, ম্যালোর্কা ও আলমেরিয়ার হয়ে খেলেন। প্রতিপক্ষের বল আটকে দেওয়া ও শক্তিশালী শটের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত। ঘানার পক্ষে তিনি প্রায় ৪০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন এবং তিনটি আফ্রিকা কাপ অফ নেশন্স-এ অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবল লীগের শীর্ষ স্তর প্রিমিয়ার লীগের ক্লাব আর্সেনাল এবং ঘানা জাতীয় দলের হয়ে মধ্যমাঠের খেলোয়াড় হিসেবে খেলেন।

অন্যদিকে ডাচ ফুটবল কিংবদন্তি ক্ল্যারেন্স সিডর্ফও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জানান, সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশেষত আমার স্ত্রী সোফিয়ার প্রতি, তিনি আমাকে গভীরভাবে ইসলামের অর্থ উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন। ক্ল্যারেন্স সিডর্ফ একজন পরিশ্রমী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কমপক্ষে ছয়টি ভাষায় তিনি কথা বলতে পারেন। তিনি ডাচ জাতীয় দলে ৮৭ বার খেলেছেন এবং তিনটি উয়েফা ইউরোপিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। ১৯৯৮ সালের ফিফা বিশ্বকাপে খেলেছেন এবং পরবর্তী তিনটি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল থেকেই মিলবে বিদ্যুৎ, চলবে গাড়ি

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের তালিকায় এবার যোগ হতে যাচ্ছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলকে ব্যবহার করে জ্বালানির উৎপাদন। কারণ যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোটা পৃথিবী জুড়ে বাড়ছে জ্বালানির চাহিদা। তার সঙ্গে মাত্রা ছাড়া পরিবেশ দূষণ। এই দুইয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল। যাকে দহন করে সহজেই মিলবে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ফলে সারা পৃথিবীর একমাত্র ভরসা প্রকৃতির জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন সাশ্রয় হবে তার সঙ্গে এই পৃথিবীর মাটি হয়ে উঠবে পরিবেশবান্ধব। মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশ রুক্ষ হয়ে উঠছে। কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার রুখে দিয়ে পৃথিবীকে পরিবেশবান্ধব রূপে গড়ে তোলা যায় তাই নিয়ে প্রতিনিয়ত চলছে গবেষণা। গবেষকদের দাবি হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল হলো একটি হাইড্রোজেন গ্যাস সমৃদ্ধ ফুয়েল অর্থাৎ জ্বালানি কোষ। এই কোষটিকে দহন করলে তার মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন অণু পুড়ে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ, তাপ এবং পানি উৎপন্ন করে। উৎপন্ন হওয়া বিদ্যুৎ ব্যাটারিতে সঞ্চয় করলে তার থেকে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা দিয়ে অতি সহজেই চলবে গাড়ি। এমনকি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সংস্থায় পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে ওই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে সহজেই। পাশাপাশি রান্নার গ্যাসের জন্য জ্বালানি হিসাবে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের ব্যবহার করা যাবে। ফুয়েল সেল কীভাবে কাজ করে? এ বিষয়ে গবেষকরা জানিয়েছেন, মূলত একটি ফুয়েল সেল অর্থাৎ কোষ ফুয়েল সেল স্কেলের ওপর কাজ করে। যার প্রধান কাজ রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর ঘটানো। ওই স্কেলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করে তার থেকে তড়িৎ কোষ উৎপন্ন হয়। ওই তড়িৎ কোষগুলি ব্যাটারিতে সঞ্চয় করলে তা থেকে প্রয়োজন মতো বিদ্যুৎ মিলবে সহজেই। এমনকি বিজ্ঞানীরা এও বলেছেন, যে কোনো গাড়ির ব্যাটারি মূলত বড় আকারের হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ অনেক ছোট মাপের ব্যাটারিতে সঞ্চয় করা যাবে। একবার ওই ব্যাটারি চার্জ করলেই ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গড়াতে পারবে আমাদের সাধের গাড়ি।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ইমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে তার বলতে কি আল্লাহ না-কি আদমকে বুঝানো হয়েছে?

-মাহফুজুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এটি একটি ছহীহ হাদীছ। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার অন্য ভাইয়ের সাথে মারামারি করে, তখন সে যেন তার ভাইয়ের মুখমণ্ডলে আঘাত করা হতে বিরত থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম-কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১২)। এটি মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানে। অন্যে পক্ষে এটি জানা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সালাফদের কারো কারো মতে, এখানে صورة শব্দের অর্থ হলো গুণাবলি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম-কে তার নিজের গুণাবলিতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেমন শুনেন, দেখেন এবং যখন ইচ্ছা কথা বলেন, ঠিক আদমকেও সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালাম ও দেখেন, শুনেন এবং যখন ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহ তাআলার মুখমন্ডল আছে, আদম আলাইহিস সালাম-এরও মুখমন্ডল আছে। তবে আল্লাহর দেখা, শুনা ও কথা বলার ধরণ আদম আলাইহিস সালাম -এর দেখা, শুনা ও কথা বলার মতো নয়। কেননা কোন কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয় (আশ-শুরা, ৪২/১১)। বরং আল্লাহর গুণাবলি তার মর্যাদা ও মহত্বের জন্য যেমনটি মানায় তেমনই।

প্রশ্ন (২) : মসজিদের ইমাম তাবীয দ্বারা চিকিৎসা করলে তার পিছনে ছালাত হবে কি?

-মো. জহিরুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : তাবীয ঝুলানো শিরক। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (বায়আত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হলো। তিনি নয় জনের নিকট থেকে বায়আত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বায়আত নিলেন না। ছাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি নয় জনের বায়আত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এই ব্যক্তির বায়আত গ্রহণ করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, এর শরীরে তাবীয রয়েছে তাই। অতঃপর সে নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললো। তারপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকেও বায়আত নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায়, সে ব্যক্তি শিরক করে (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪২২, সিলসিলা ছহীহা, হা/৪৯২)। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও জাদুটোনা শিরকী কাজ (আবূ দাউদ, হা/৩৮৮৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৩০; মিশকাত, হা/৪৫৫২)। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো, সে শিরক করলো' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪২২)। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'যে লোক কোনকিছু ঝুলিয়ে রাখে. তাকে তার উপরই সোপর্দ করা হয়' (তিরমিযী, হা/২০৭২, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৭৮৬)। যদি ইমাম সাহেব এমন তাবীয দ্বারা চিকিৎসা করে যাতে শিরকী কথা আছে যেমন আল্লাহ ছাড়া কোন ফিরিশতা, নবী অথবা সৎ ব্যক্তির কাছে দুআ করা তাহলে এমন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না। এমনকি কুরআন মাজীদের আয়াত দিয়ে তাবীয লিখলেও তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে না।

প্রশ্ন (৩) : 'মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ' এবং 'অন্তর রবের ঘর'। উক্ত বর্ণনা দুটি কি সঠিক?

উত্তর : বর্ণনাটি মিথ্যা ও উদ্ভট (কাশফুল খাফা, হা/১৮৮৬; ইমাম ছাগানী, আল-মাওযূ'আত, হা/৭০; আল-মাছনূ ফী মা'রেফাতিল হাদীছিল মাওযূ' হা/২১৭, পৃ. ১৩১)। উক্ত ভিত্তিহীন বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, আল্লাহ সব মুমিনের অন্তরে বিরাজমান। যেহেতু পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন। তাই মুমিনের অন্তরকে আল্লাহর আরশ কল্পনা করা হয়েছে। (নাঊযুবিল্লাহ)

(খ) অনুরূপ দ্বিতীয় বর্ণনাটিও মিথ্যা ও বাতিল (আল-মাছনূ ফী মা'রেফাতিল হাদীছিল মাওযূ' হা/২১৭, পৃ. ১৩১)। উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝানো হয় যে, যার অন্তর আছে তার মধ্যেই আল্লাহ আছে। সুতরাং 'যত কল্পা তত আল্লাহ' (নাঊযুবিল্লাহ)। এভাবে সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সাব্যস্ত করা

হয়েছে। সঠিক আক্বীদা হল, মহান আল্লাহ সপ্তম আকাশের উপরে আরশে সমুন্নত (ত্ব-হা, ৫)। তাঁর ক্ষমতা ও দৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (ত্ব-হা, ৪৬)।

প্রশ্ন (৪) : আল্লাহর ছিফাতসমূহকে কুদরত বলা এমন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মো. সামিউল ইসলাম
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : আল্লাহ তাআলার ছিফাতগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ছাড়া খেয়ালখুশি মতো ব্যাখ্যা করা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং এটি হলো ভ্রান্ত আকীদার বহিঃপ্রকাশ। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বৈশিষ্ট্য হলো তারা আল্লাহ তাআলার সকল ছিফাতকে কুরআন ও সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে সেভাবেই সাব্যস্ত করে, কোনটির অপব্যাখ্যা করে না। তবে কোন ব্যক্তি যদি আল্লহর ছিফাতকে অস্বীকার না করে, বরং সংশয় সন্দেহের কারণে কোন কোন ছিফাতের অপব্যাখ্যা করে যেমন আল্লাহর হাত মানে কুদরত ইত্যাদি, তাহলে এর দ্বারা সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে না (মাজমু ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ৭/৫০৭)। আহলে সুন্নাতের কোন ইমাম পাওয়া গেলে আল্লাহর ছিফাতকে অপব্যাখ্যাকারী কোন ব্যক্তিকে নির্ধারিত ইমাম বানানো উচিত নয়। তবে যদি এমন ব্যক্তিই ইমাম নিযুক্ত থাকে আর এর পিছনে ছালাত আদায় করে তবে তার ছালাত ছহীহ হবে ইনশা-আল্লাহ। আর আল্লাহই অধিক অবগত।

বিদআত

প্রশ্ন (৫) : আমাদের এলাকাতে ঈদগাহে শামিয়ানা টাঙানো হয় এবং ইদগাহ সুন্দরভাবে সাজানো হয়। এটি কি শরীয়তসম্মত?

-মাহফুজুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কাজটি শরীয়তসম্মত নয়। ঈদের ছালাত ফাঁকা জায়গায় ও উন্মুক্ত স্থানে আদায় করাই সুন্নাত। কেননা মসজিদে নববীর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে ছালাত আদায় করলে অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ নেকি বেশি হয়। তারপরেও তিনি সেখানে ছালাত আদায় না করে প্রায় ৫০০ গজ দূরে গিয়ে খোলা ময়দানে উন্মুক্ত স্থানে ছালাত আদায় করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬)। এসব হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রোদ-বৃষ্টির কারণে শামিয়ানা ঈদের মাঠে টাঙানো যাবে না এবং ঈদের মাঠকে সাজানো যাবে না। কেননা এটি একটি নব আবিষ্কৃত বিষয়। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (৬) : হাদীছ থেকে জানা যায়, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সারা শরীর মাসাহ করতেন। কিন্তু অনেকে বুকে ফুঁ দেয়। এক্ষণে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে বুকে ফুঁ দেওয়া যাবে কি?

-মিনহাজ পারভেজ
নাটোর।

উত্তর : সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে বুকে ফুঁক দেওয়ার বিষয়টি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই এই আমল বর্জন করতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তাহলে সেটি প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তবে বুকে নয়, রোগ ব্যাধির জন্য সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে শরীরে ফুঁক দিতে পারে।

প্রশ্ন (৭) : 'ইমাম আবূ হানিফা রহিমাহুল্লাহ আল্লাহকে ৯৯ বার দেখেছেন' মর্মে বর্ণিত কাহিনী কি সত্য?

-মো. তুহিন ইসলাম রাতুল
গাজীপুর।

উত্তর: উক্ত ঘটনাটি বানোয়াট যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। সুতরাং একজন সম্মানিত ইমাম সম্পর্কে এধরনের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কোন মুসলিমের জন্য আদৌ জায়েয নয়। কেননা এই চক্ষু দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত' (আল-আন'আম, ৬/১০৩)। মূসা আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহকে দেখতে চাইলেন, তখন আল্লাহ বললেন, 'কখনই (দুনিয়াতে) তুমি আমাকে দেখতে পাবে না' (আল-আরাফ, ৭/১৪৩)। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে এই ধরনের মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করা হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৮) : ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে কি?

-আকীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : না, ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে না। এমনকি কোনো ক্বিরাআত, গযল, সঙ্গীত কিছুই

বলা যাবে না। বরং প্রথমে ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর খুৎবা দিতে হবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং সেখানে প্রথমে যা করতেন তা হলো ছালাত। অতঃপর জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন আর জনতা তখন নিজেদের কাতারে বসা থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। আর যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তাদেরকে বাছাই করতেন অথবা যদি কাউকে কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকত, নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ি ফিরে যেতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪; মিশকাত, হা/১৪২৬)। উল্লেখ্য যে, ঈদের ছালাতের পূর্বে খুৎবা দেওয়ার প্রচলন শুরু করেন মারওয়ান ইবনু হাকাম (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)। তখন প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার সেই কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৫৬)। সুতরাং খুৎবার পূর্বে কোন বক্তব্য দেওয়া চলবে না, বরং আগে ঈদের ছালাত আদায় করতে হবে।

ইবাদত- ছালাত

প্রশ্ন (৯) : কেউ যদি যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার ছালাত যথাসময়ে জামাআতে আদায় করে। কিন্তু ফজরের ছালাত নিয়মিত ত্যাগ করে পরবর্তীতে যোহরের আগে অথবা পরে অথবা অন্যকোনো সময়ে আদায় করে নেয় তবে তার বিধান কি হবে?

-মুহাম্মাদ আল ইমরান
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

উত্তর : ছালাতের ব্যাপারে উক্ত কথা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। সকল কাজের আগে ছালাতকে প্রধান্য দিতে হবে। যেকোনো মূল্যে নির্ধারিত সময়েই ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে ছালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য' (আন-নিসা, ৪/১০৩)। আর ছালাত বাদ দিয়ে বা ছালাতকে তুচ্ছ মনে করে অন্য ইবাদত করে কোনো লাভ হবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই শুদ্ধ হবে। আর ছালাতের হিসাব ঠিক না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে' (ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/১৮৫৯, সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩৫৮)। সুতরাং নিয়মিতভাবে ফজরের ছালাত ক্বাযা করার এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। আর ওয়াক্তমত ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এরপরও কোন কারণবশত কোনদিন ঘুম থেকে উঠতে না পারলে যখন জাগ্রত হবে, তখনই আদায় করে নিবে। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا 'যদি কেউ কোন ছালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই আদায় করে নিবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪; মিশকাত, হা/৬০৩)।

প্রশ্ন (১০) : জুমআর ছালাত কত রাকা'আত? আর দুই রাকা'আত ফরয পরে কত রাকা'আত সুন্নত আদায় করতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাজীপুর।

উত্তর : জুমআতে ফরয ছালাতের পরিমাণ হলো দুই রাকা'আত। জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশী দুই রাকা'আত করে নফল ছালাত আদায় করবে (ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৩)। অন্যথায় কেবল তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে দুই রাকা'আত পড়ে বসবে (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৩)। জুমআর পরে যদি মসজিদে সুন্নাত ছালাত আদায় করতে চায় তাহলে চার রাক'আত আদায় করবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুমআর ছালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকা'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮১)। আর যদি বাড়ীতে আদায় করতে চায় তাহলে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আহর দিন নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) তিনি দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৯৩৭, ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮২)।

প্রশ্ন (১১) : দাঁড়াতে পারে, রুকূ' করতে পারে কিন্তু পা ভাজ করে বসতে পারে না এক্ষেত্রে কিভাবে ছালাত আদায় করা উচিত। আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না?

-হারুনুর রশীদ
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ছালাতের বেশ কিছু রুকন ও ওয়াজিব কাজ আছে যেগুলো কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন. রুকূ‘ করা, সিজদা করা সেই রুকনগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা ছালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে’ (আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে ছালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, ‘দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে। যদি তাও না পারো তাহলে শুয়ে ছালাত আদায় করবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭, তিরমিযী, হা/৩৭২, আবূ দাউদ, হা/৯৫২)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, মানুষ তার শরীরের গতি অনুযায়ী ছালাত আদায় করবে। সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে, না হলে বসে, আর না হলে শুয়ে ছালাত আদায় করবে। তবে একেবারে নিরূপায় হয়ে চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (১২) : প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রেজাউল হক
দক্ষিন চব্বিশ পরগনা, ভারত।

উত্তর : প্রথমত মানুষ বা যেকোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত কোনো পোশাক পরিধান করা জায়েয নেই। ছোট-বড় সকল মুসলিমের জন্য এ ধরনের পোশাক পরিধান করা অবৈধ। আর প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক পরে ছালাত আদায় করাও জায়েয নয়। কেউ যদি এ ধরনের পোশাক পরে ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত ছহীহ হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না যেখানে ছবি বা কুকুর রয়েছে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৬)।

প্রশ্ন (১৩) : নিয়মিত যোহর ছালাতের পূর্বের সুন্নাত না পড়লে কোনো সমস্যা হবে কি?

-মো. আব্দুস সামাদ
দিনাজপুর।

উত্তর : সুন্নাত ছালাত আদায়ের ফযীলত অনেক। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সুন্নাত ও নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া। উম্মু হাবীবা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট বারো রাকা‘আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করে তার বিনিময়ে জান্নাতে ঐ ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। এ সুন্নাতগুলো হলো- যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকা‘আত ও পরে দুই রাকা‘আত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাকা‘আত, ইশার (ফরযের) পর দুই রাকা‘আত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকা‘আত (ছহীহ মুসলিম হা/৭২৮, তিরমিযী, হা/৪১৪)। আবার ক্বিয়ামতের দিন ফরয ইবাদতের ঘাটতি হলে আল্লাহর হুকুমে নফল ইবাদতের নেকি দ্বারা তা পূর্ণ করা হবে (আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪; তিরমিযী, হা/৪১৩)। তবে অবজ্ঞা না করে অলসতা বা কোনো কারণবশত সুন্নাত ছেড়ে দিলে সমস্যা নেই। আর কোন ব্যক্তি নফল ছালাত ছাড়ার কারণে গুনাহগার হয় না। তবে অবশ্যই তিনি বড় ধরণের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন (১৪) : দুই রাকা‘আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক করে বসা কি সুন্নাত?

-মো. জহিরুল ইসলঅম
ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের যে বৈঠকে সালাম আছে সেখানেই তাওয়াররুক করে বসবে। আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সবশেষে তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পূর্বের সিজদা শেষ করে বাম পা বাইরের দিকে বের করে বাম পাশের নিতম্বের উপর বসতেন (আবূ দাউদ, হা/৯৬৩, ইবনু মাজাহ, হা/১০৬১)।

প্রশ্ন (১৫) : মহিলা ইমামের পিছনে মহিলারা ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আলাউদ্দীন আলী
ঢাকা।

উত্তর : না, মহিলার ইমামতিতে ঈদ ও জুমআর ছালাত আদায় করা যাবে না। তাছাড়া ঈদের ছালাতে খুৎবা আছে। আর মহিলাদের জন্য খুৎবা দেওয়া জায়েয নয়। শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে কেউ এমন কোন আমল করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (১৬) : তারাবীহ ছালাত জামা‘আতে আদায় করার পর রাতের অনেক সময় বাকি থাকে। প্রশ্ন হলো- রাতে আমরা তারাবীহ ব্যতীত অতিরিক্ত নফল ছালাত আদায় করতে পারবো কি?

-ফজলে রাব্বী
মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্দা।

উত্তর : উত্তম হলো তিন রাকা'আত বিতরসহ মোট এগারো রাকা'আত ছালাত আদায় করা। আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রাহমান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযান মাসে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) এগার রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি সেই ছালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি আরো চার রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তামীম আদ-দারী ও উবায় ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন লোকদেরকে নিয়ে এগারো রাকা'আত ছালাত আদায় করে (মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৭৯)।

প্রশ্ন (১৭) : ইমামের সাথে তারাবীহ সম্পন্ন করে বাড়িতে এসে একাকী বিতর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ফজলে রাব্বী
মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্দা।

উত্তর : হ্যাঁ; যাবে। তারাবীহর ছালাত জামাআতে পড়া যেমন জরুরী নয়, তেমনই বিতর ছালাতও জামাআতে পড়া জরুরী নয়। কোন মুসল্লীর আরো ছালাত আদায়ের জন্য অথবা একাই বিতর ছালাত আদায়ের জন্য তারাবীহর ছালাতের পরে বাড়ি চলে যাওয়া, এমন আমলের কোন প্রমাণ নেই। বরং বিতরসহ তারাবীহ একা পড়াই উত্তম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরেও ছালাত আদায় করো। কারণ, মানুষের সবচেয়ে উত্তম ছালাত হল যা সে তার ঘরে আদায় করে, তবে ফরয ছালাত ছাড়া (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯০)।

ইবাদত- ছিয়াম

প্রশ্ন (১৮) : শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত কি?

-মনিরুল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : রামাযানের ছিয়াম পালনের পরে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ বছর ছিয়াম পালনের নেকি পাওয়া যায়। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন পুরো বছরই ছিয়াম পালন করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; মিশকাত, হা/২০৪৭)।

প্রশ্ন (১৯) : শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে আদায় করতে হবে, না-কি বিচ্ছিন্নভাবেও আদায় করা যাবে? আর এই দুটির মধ্যে কোনটি করা উত্তম।

-ফাতিমা খাতুন
বরিশাল।

উত্তর : শাওয়ালের ছিয়ামগুলো একাধারে আদায় করা শর্ত নয়, বরং আলাদা আলাদাভাবেও আদায় করা যায়। আবূ আইয়ুব আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন ছিয়াম পালন করে, সে যেন সারা বছরই ছিয়াম পালন করল' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪)। এখানে একাধারে আদায় করতে হবে এমন কোন শর্ত করা হয়নি। সুতরাং শাওয়াল মাসের যেকোনো দিনে আদায় করা যাবে। তবে যত তাড়াতাড়ি আদায় করা যায় ততই ভালো। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' (আলে ইমরান, ৩/১৩৩)। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে পালন করার চেয়ে একাধারে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করাই বেশি উত্তম।

প্রশ্ন (২০) : রামাযান মাসে আমার হায়েয চলার কারণে আমি কয়েকটি ছিয়াম পালন করতে পারিনি। আমার প্রশ্ন হলো, শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করার সময় যদি আমি রামাযানের ক্বাযা করার নিয়াত করি তবে কি সেই ক্বাযা আদায় হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
.....।

উত্তর : রামাযানের ক্বাযা আদায়ের নিয়্যতে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করা শরীয়তসম্মত নয়। কেননা রামাযানের ছিয়াম এবং শাওয়ালের ছিয়াম দুটি পৃথক পৃথক ইবাদত যেগুলো সত্ত্বাগতভাবেই উদ্দেশ্য। সুতরাং দুটিকে একত্রিত

করা ছহীহ নয় (ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলামিয়্যা, ৭/১১৮৩)। রামাযানের ক্বাযার নিয়্যতে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে তাতে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের নেকি অর্জিত হবে না। বরং তাতে পৃথকভাবে নিয়্যত করে অন্য দিনে ছিয়াম পালন করবে।

প্রশ্ন (২১) : যারা শুধু রামাযান মাসে ছালাত আদায় করে ও ছিয়াম পালন করে তাদের ইবাদত কবুল হবে কি?

উত্তর : এমন মানুষের ইবাদাত কবুল হবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অনেক ছিয়াম পালনকারী এমন আছে যারা তাদের ছিয়ামের বিনিময়ে ‘ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া’ আর কোন ফল লাভ করতে পারে না। এমন অনেক ক্বিয়ামরত (দন্ডায়মান) ব্যক্তি আছে যাদের রাতের ‘ইবাদাত নিশি জাগরণ ছাড়া আর কোন ফল আনতে পারে না (মুসনাদ আহমাদ, হা/৯৬৮৩; মিশকাত, হা/২০১৪)। সাথে সাথে রাসূল বলেছেন, ‘যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত আদায় করে না তারা কাফের’।

প্রশ্ন (২২) : রামাযান মাসে ছুটে যাওয়া ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করার আগে যদি শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালন করি, তাহলে সেটি কি সঠিক হবে?

-আতাউর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ; রামাযানের ক্বাযা আদায় করার আগে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করলে তা সঠিক হবে। কেননা রামাযানের ছিয়াম হলো ফরয, যা ঋতু বা অসুস্থতার কারণে ছুটে গেলে অন্য যেকোনো সময় আদায় করে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে’ (আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম প্রায় দশ মাস পরে শা‘বান মাসে আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০)। আর শাওয়ালের ছিয়াম হলো নফল, যা শাওয়াল মাসেই আদায় করতে হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ‘যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন ছিয়াম পালন করে, সে যেন সারা বছরই ছিয়াম পালন করল’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪)। সুতরাং রামাযানের ক্বাযা আদায় করার আগে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করলে তা সঠিক হবে।

প্রশ্ন (২৩) : সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর জন্য মাইকে আযান দেওয়া, গজল গাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, বক্তব্য দেওয়া ও সাইরেন বাজানো যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘বিলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাত থাকতেই আযান দেয়। কাজেই ইবনু উম্মু মাকতূম রাযিয়াল্লা-হু আনহু আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান করো’। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ইবনু উম্মু মাকতূম রাযিয়াল্লা-হু আনহু ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাঁকে বলে দেওয়া হতো যে, ‘ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে’ ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না (ছহীহ বুখারী, হা/৬১৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯২)। আযান দেওয়া ব্যতীত গজল গাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, বক্তব্য এবং সাইরেন বাজানো এগুলোর কোনটিই শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়, বরং এগুলো বিদআত। সুতরাং এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৪) : বিগত রামাযানের বেশ কয়েকটি ছিয়াম বাকি আছে। এ ছিয়াম কি ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে না-কি বিরতি দিয়ে আদায় করা যাবে?

-জাহাঙ্গীর আলম
উত্তরামপুর, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন না করে বিরতি দিয়েও পালন করা যাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তারা অন্য দিনগুলোতে পুরণ করবে (আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)। এখানে ধারাবাহিকভাবে পালন করার শর্ত করা হয়নি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বিরতি দিয়ে রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পালন করা যাবে। তবে ধারাবাহিকভাবে পালন করাই অধিক উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে’ (আলে ইমরান, ৩/১৩৩)। সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে পালন করার চেয়ে একাধারে রামাযানের ছিয়াম পালন করাই বেশি উত্তম।

প্রশ্ন (২৫) : কোনো ব্যক্তি যদি রামাযানে রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করে ঘুমিয়ে যায় এবং অপবিত্র অবস্থায় সাহারী খেয়ে ছিয়াম রাখে, তাহলে উক্ত ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?

-আমাতুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : যদি ফজর উদিত হওয়ার আগে গোসল না করে, বরং অপবিত্র অবস্থায় সাহারী খেয়ে ছিয়াম থাকে তবুও তার ছিয়াম শুদ্ধ হবে। আবূ বাকর ইবনু 'আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি স্বপ্নদোষ ব্যতীতই স্ত্রী সহবাসের কারণে জুনুবী অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থেকেছেন এবং এরপর ছিয়াম পালন করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩১)। আবূ বাকর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মারওয়ান তাকে উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট পাঠালেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য যার জানাবাতের (অপবিত্র) অবস্থায় ভোর হলো, সে ছিয়াম পালন করতে পারবে কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্নদোষ ব্যতিরেকে স্ত্রী সহবাসের কারণে গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ভোর হত। এরপর তিনি ছিয়াম ভঙ্গও করতেন না এবং ছিয়ামের ক্বাযাও করতেন না (ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৯)। তবে রোগ ব্যাধি না থাকলে ফজরের ছালাতের আগে অবশ্যই তাকে গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (২৬) : লায়লাতুল ক্বদর কি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে না-কি এক সাথে? যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে তাহলে, সৌদি আরবে বিজোড় রাত হলে আমাদের দেশে জোড় রাত হয়। এক্ষণে আমরা কিভাবে লায়তুল ক্বদর খুঁজব?

-কাজী দ্বীন ইসলাম দিপু
শরীয়তপুর।

উত্তর : ক্বদরের রাত মহান আল্লাহর গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের বিশ্বের ২৪ ঘন্টার সীমাবদ্ধ দিন রাতের যে সময় তা আল্লাহর সৃষ্টি। মহান আল্লাহর গায়েবেও এভাবেই এই সময়েই সবকিছু হয় এটা ভেবে নেওয়া জায়েয নয়। কেননা মহান আল্লাহ তার নিজের সৃষ্টি করা সময়ের উর্ধ্বে (সুবহানাহু তাআলা)। সুতরাং লাইলাতুল ক্বদরকে নিজের হিসাবে তুলনা করে প্রশ্ন উত্থাপন করা মূলত গায়েবের বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা যা মোটেই ঠিক নয়। কেননা মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির যেমন সীমা রয়েছে তেমনি মানুষের চিন্তাশক্তিরও সীমা রয়েছে। আর গায়েবের এই বিষয়গুলো মানুষের চিন্তাশক্তির বাহিরে। এটি মহান আল্লাহ নিজেই পরিচালনা করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লায়লাতুল ক্বদর রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোতে অন্বেষণ করতে বলেছেন। তাছাড়া কোন তারিখে লায়লাতুল ক্বদর হবে? সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করে কিছু বলে যাননি। বরং তিনি একাধিক হাদীছে বলেছেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাত্রিতে ক্বদর তালাশ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭; মিশকাত, হা/২০৮৩)। সুতরাং এই শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলোতে অন্বেষণ করলেই আশা করা যায় লায়লাতুল ক্বদর পেয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২৭) : বিগত দিনের ছুটে যাওয়া ছিয়াম না জানার কারণে ক্বাযা আদায় করা হয়নি। এখন সেই ছিয়ামগুলো সম্পর্কে শারঈ বিধান কী?

-জসিম আলী
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : বিগত দিনের ছুটে যাওয়া ছিয়ামের সংখ্যা যদি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে, তাহলে অবশ্যই সেগুলোতে একটি ছিয়ামের বদলে একটি ক্বাযা করতে হবে। স্বেচ্ছায় ছিয়াম ছেড়ে দিলে একটি ছিয়ামের বদলে একটিই ক্বাযা করতে হয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো লোকের ছিয়াম থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে সে লোককে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু কোনো লোক ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে (তিরমিযী, হা/৭২০)। তবে বিগত দিনের ছিয়ামের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে তার ক্বাযা আদায় করবে না। এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। মানুষ বিনয়ী হয়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বলেন, (হে নবী) 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)।

পারিবারিক বিধান- আক্বীক্বা

প্রশ্ন (২৮) : সাতদিন বয়স হওয়ার আগে কোনো বাচ্চা মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-আতাউর রহমান
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

উত্তর : না, সাতদিন বয়স হওয়ার আগেই কোনো বাচ্চা মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে

বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল শিশুই তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে (আবূ দাউদ, হা/২৮৩৭; তিরমিযী, হা/১৫২২)। এই হাদীছে আক্বীক্বা করা সপ্তম দিনেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং সপ্তম দিনের আগেই বাচ্চা মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৯৭-৯৮)।

মৃতের বিধান- জানাযা

প্রশ্ন (২৯) : মৃত মহিলাকে গোসল দেওয়ার পর শরীরে আতর, করপুর, সুরমা লাগানো যাবে কি?

-শাহজালাল, নওগাঁ।

উত্তর : মুহরিম ব্যতীত সাধারণভাবে মৃত্যুবরণকারী মায়্যেতের শরীরে বা কাফনের কাপড়ে, গোসলের সময় বা পরে সুগন্ধি জাতীয় জিনিসের ব্যবহার করা জায়েয। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যদি তোমরা মায়্যেতকে সুগন্ধি লাগাও তাহলে তিনবার লাগাও' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৫৮০)। আসমা' বিনতু আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহা মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারের লোকদের অছিয়ত করে বলেন, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমাকে সুগন্ধ ধুঁয়া দিবে অতঃপর সুগন্ধি ব্যবহার করবে (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৬৯৫১; মুয়াত্বা, হা/৫৩০)। যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর গোসলের সময় রাসূল ﷺ কর্পুর (সুগন্ধি) ব্যবহার করতে আদেশ করেছিলেন (ছহীহ বুখরী, হা/১২৫৩)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সে ছিল ইহরাম অবস্থায়। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠ অবস্থায় উঠিয়ে নিবেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৭)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ইহরাম অবস্থায় মারা গেছেন এমন মায়্যেত ব্যতীত সকল ময়্যেতকে সুগন্ধি লাগানো যাবে। তবে সুরমা লাগানোর কথা হাদীছে পাওয়া যায় না। তাই এমনটি করা জায়েয নয় (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ৭/৩৪০)।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ

প্রশ্ন (৩০) : কাজী অফিসে গিয়ে আমি বিয়ে করি, আমার বিয়ের সাক্ষী থাকে আমার বন্ধু ও তার স্ত্রী। আরো সাথে ছিলেন কাজীর সাথের এক ব্যক্তি। আমার শ্বশুর বেঁচে নেই, তাই আমার স্ত্রী তার মায়ের অনুমতি নিয়ে আমার সাথে বিয়ে বসে। আমি জানতে চাই আমাদের বিয়ে কি ইসলাম মোতাবেক হয়েছে?

-মো. তোয়াছিন
চাঁদপুর।

উত্তর : কোনো নারী বিবাহের অভিভাবক হতে পারবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোনো নারী নিজেও বিবাহ করতে পারে না। যে নারী নিজে বিবাহ করে সে ব্যভিচারিণী' (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২; মিশকাত, হা/৩১৩৭)। অভিভাবক ছাড়াই যেহেতু এই বিবাহ হয়েছে তাই এটি শরীয়তসম্মত হয়নি। আবূ মূসা আশআরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাউদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১, মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৭৪৬; মিশকাত, হা/৩১৩০)। রাসূলুল্লাহ আরো বলেছেন, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো নারী বিবাহ করলে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল (আবূ দাউদ, হা/২০৮৩, তিরমিযী, হা/১১০২)। এক্ষেত্রে মেয়ের দাদা অভিভাবক হবে, দাদা না থাকলে নিজ ভাই এভাবে তার নিকটাত্মীয়গণ অভিভাবক হবে (আশ-শারহুল মুমতে', ১২/৮৪ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩১) : বিবাহে মেয়েকে কবূল বলানো কি শরীয়তসম্মত?

-মাহফুজ
রাজশাহী।

উত্তর : কনেকে কবূল বলাতে হবে না। কেননা কনেকে কবূল বলাতে হবে মর্মে কুরআন ও হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের অভিভাবক তার সম্মতি নিয়ে বিবাহের মজলিশে দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে বরকে বলবে, আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে রাজী, তুমি তাকে স্ত্রী হিসেবে কবূল করো। তখন বর বলবে, আমি কবূল করলাম। এতেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিবাহের মজলিশে খুতবা দেওয়া সুন্নাত।

রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারবে না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেমন করে তার অনুমতি নেয়া হবে? তিনি বললেন, চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার অনুমতি (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৬, ৫১৩৭)। সুতরাং সমাজে প্রচলিত কনের কাছে দুই সাক্ষী নিয়ে গিয়ে তাকে কবূল বলানোর প্রথা বর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩২) : বিবাহের সময় ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-মতিউর, ঢাকা।

উত্তর : না, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করা যাবে না। কেননা এগুলো বিজাতীয়দের থেকে আগত কুসংস্কার। আর বিজাতীয়দের সাদৃশ্য অবলম্বন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১)। সুতরাং গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে হবে। তবে অনুষ্ঠান ছাড়াই বর-কনে গায়ে হলুদ দিতে পারে যা খালা, ফুফু, দাদী, নানী ও নিজ বোনেরা বাস্তবায়ন করবে। একদা রাসূল ﷺ আব্দুর রহমান ইবনু আউফের শরীরে হলুদ চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, ‘তুমি কি বিবাহ করেছ’ (আবূ দাউদ হা/২১০৯)। এতে বুঝা যায়, বর-কনে উভয়েই গায়ে হলুদ দিতে পারে। তবে প্রচলিত যুবতী মেয়েদের মাধ্যমে হলুদ মাখার অনুষ্ঠান অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩) : একজন পুরুষের বিবাহ না হলে তার চরিত্র রক্ষা করা কঠিন হচ্ছে। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে বিবাহ দিতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে সে আরো পড়াশোনা করুক, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক। তাদের তেমন ইসলামের জ্ঞান নেই আর তারা তেমন দ্বীনদারও না। এমতাবস্থায় সেই ছেলে কি তার পিতা মাতার ইচ্ছার বাহিরে একা কোথাও বিবাহ করতে পারবে? হাদীছে তো বর্ণিত আছে, পিতা মাতার অবাধ্যতা হারাম।

-নিয়াজ মোরশেদ
কালকিনি, মাদারীপুর।

উত্তর : চরিত্র রক্ষা করার জন্য বিবাহ করা এবং পিতা-মাতার আনুগত্য করা উভয়টিই অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে শরীয়তে বিবাহের গুরুত্বের বিষয়টি পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে এবং যথাসম্ভব তাদেরকে বুঝিয়ে ও রাজী করে তাদের মতে বিবাহ করতে হবে। আর যদি একান্তই তারা বিবাহ দিতে রাজী না হয় তাহলে তাদের প্রতি সদাচরণ এবং তাদেরকে সাধ্যমতো সন্তুষ্ট রেখে ছেলে বিবাহ করে নিজের চরিত্রের সুরক্ষা করবে। আবূ সাঈদ ও ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তির কোনো সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে। আর (উত্তম) আচার-আচরণ শিক্ষা দেয় এবং যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যেন তার বিয়ে দেয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যদি বিয়ে না দেয় এবং ঐ সন্তান যদি কোনো পাপ করে, তবে ঐ পাপের বোঝা পিতার ওপর বর্তাবে’ (মিশকাত, হা/৩১৩৮)।

পারিবারিক বিধান- তালাক

প্রশ্ন (৩৪) : এক মহিলার তালাক হওয়ার পর ইদ্দত পালন শেষে যদি পরবর্তিতে আবার বিবাহ করতে চায় তাহলে কি তার জন্য অভিভাবকের অনুমতি লাগবে? না-কি সে নিজেই বিবাহ করতে পারবে?

-শামীম
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কুমারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাসহ সকল মহিলার বিবাহে তার অভিভাবক থাকা শর্ত। নবী ﷺ বলেছেন, ‘অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না’ (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১; আহমাদ, হা/১৯৭৪৬; মিশকাত, হা/৩১৩০)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, ‘কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোনো নারী নিজেও বিবাহ করতে পারে না। যে নারী নিজে বিবাহ করে সে ব্যভিচারিণী’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২; মিশকাত, হা/৩১৩৭)। সুতরাং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাও নিজে নিজের বিবাহ দিতে পারবে না, সুতরাং তার পরের বিবাহতেও অভিভাবকের অনুমতি লাগবে। উল্লেখ্য যে, ছহীহ মুসলিমের ১৪২১ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী বলেছেন, الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ‘পূর্ব বিবাহিতা তার নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হক্বদার’ এই হাদীছের অর্থ হলো, স্বামী পছন্দের ক্ষেত্রে অভিভাবকের চেয়ে সেই মহিলারই বেশি অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে অভিভাবকের শর্ত থেকে মুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৩৫) : এক আলেম বলেছেন যে, মনে মনে তালাক দিলে হবে না, আর অন্য আলেম বলেছেন যে, তালাক হবে। এখন আমরা কোনটা গ্রহন করব?

-নাছিম মিয়া
ফরিদপুর।

উত্তর : মুখে উচ্চারণ না করে যদি মনে মনে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়্যত করে, তাহলে সেটি তালাক হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের জন্য তাদের মনের কল্পনাগুলোকে মাফ করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তা কথা বা কাজে পরিণত করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৬৯, ছহীহ মুসলিম, হা/১২৭)। আর যদি মুখে উচ্চারণ করে, তাহলে স্ত্রী না জানলেও সেটি তালাক হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৬) : এক ব্যক্তি দুই বছর আগে একজন বিবাহিত মহিলাকে বিয়ে করেছে। কিছুদিন আগে জানতে পারে ওই মহিলার আগের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং মহিলাও স্বামীর থেকে খোলা করেনি। এখন সেই ব্যক্তির করণীয় কি?

-মোহাম্মাদ আলমগীর
গাজীপুর।

উত্তর : যেহেতু আগের স্বামী থেকে তালাক হয়নি, তাই সেই মহিলা আগের স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই আছে। আর কারো স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাকে বিবাহ করলে সেটি বিবাহ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং সহবাস করলে তা ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, '...সকল বিবাহিতা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ' (আন-নিসা ৪/২৪)। আর ব্যভিচার করা কবীরা গুনাহ (আল-ইসরা ১৭/৩২)। সুতরাং এমতাবস্থায় সেই মহিলার সাথে সংসার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আর এই পাপের কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৭) : গার্মেন্টস থেকে পোশাক চুরি করেছি সেগুলো এখন কি করবো, ফিরিয়ে দিতে গেলে চাকরি থাকবে না এবং মান হানিও হতে পারি। আর এই পোশাক পরে কি আমার ছালাত হবে?

-নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক
ঢাকা।

উত্তর : গামেন্টসে চাকরিরত অবস্থায় এভাবে কাপড় চুরি করা আত্মসাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এসব মালামার কর্মচারীর কাছে আমানত হিসেবে থাকে। অতএব এসব কাপড় সম্ভবপর হলে মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। আর সেটি সম্ভব না হলে অথবা ফেরত দিতে গেলে সমস্যা আশংকা থাকলে সেই পোশাকের সমমূল্য মালিকের নামে অথবা কোম্পানীর নামে ছাদাকাহ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। এই কাজটি করার পরে যদি সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করে তাহলে তার সেই ছালাত ছহীহ হবে।

প্রশ্ন (৩৮) : আমি আমার দুই বন্ধুর সাথে কিছু লোকের সম্পদ নষ্ট করেছি। সেই সম্পদ কার আমি জানি না। আমি ক্ষতিপূরণ দিতে চাই। এখন কী করলে তার হক্ব আদায় হবে এবং আল্লাহর কাছে থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে?

-রাকিব
চাঁদপুর।

উত্তর : বান্দার হক নষ্ট করার গুণাহ সেই বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। বরং ক্বিয়ামতের দিন নেকি দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোনো দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোনো সৎকর্ম থাকলে তার যুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোনো সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)। সম্পদের মালিকের সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে যে পরিমাণ সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে সে পরিমাণ সম্পদ তার মালিকের নিয়্যতে আল্লাহর রাস্তায় ছাদাক্বা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

প্রশ্ন (৩৯) : কোনো ঘরে ছবি থাকলে ছালাত হয় না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ানোর পরে পকেট থেকে কোনো এমন টাকা বা পয়সা পড়ে গেল যেখানে মানুষের ছবি আছে এবং ছবিটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি আমার ছালাত হবে, না-কি ছালাত বাতিল হবে, না-কি মসজিদের সকল মুছল্লীদের ছালাত বাতিল হবে?

-নজরুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পকেট থেকে যদি টাকা পড়ে যায় যাতে মানুষের ছবি আছে, সেই টাকা পুনরায় পকেটে তুলে নিতে হবে যাতে ছালাতের খুশূ-খুযূ নষ্ট না হয়। কেননা কাপড়ে ছবি থাকলে অথবা খোলা স্থানে টাকা বা ছবি পড়ে থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা উচিত নয়। এর কারণ হলো রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যেখানে কুকুর ও ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬; মিশকাত, হা/৪৪৮৯)।

প্রশ্ন (৪০) : বিভিন্ন স্কুল, কলেজে দেখা যায় যে ক্লাসে শিক্ষক আসলে শিক্ষার্থীদেরকে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্মান জানাতে হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো এভাবে সম্মান জানানো কি শরীয়তসম্মত হবে? আর যদি না হয় তাহলে আমাদের মতো শিক্ষার্থীদের করণীয় কী?

-মল্লিকা আক্তার
ময়মনসিংহ।

উত্তর : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আসলে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানানো যাবে না, যিনি প্রবেশ করবেন তিনিই সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন। এটিই শরীয়তের মূলনীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক আনন্দিত হয় যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির মতো দাড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয় (তিরমিযী, হা/২৭৫৫)। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। অথচ তারা তাকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ করেন না (তিরমিযী, হা/২৭৫৪)। সুতরাং শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আসলেই তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য দাঁড়ানো যাবে না। আর যদি শিক্ষক তার সম্মানে দাঁড়ানোর আদেশ করে তাহলে তার সেই আদেশ মানা যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই (তিরমিযী, ৩/৩২৫)।

উল্লেখ্য যে, বুখারী (৩৮০৪) ও মুসলিমের (১৭৬৯) এক বর্ণনাতে আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, قوموا إلى سيدكم তোমরা তোমাদের সর্দারের দিকে যাও' এই বর্ণনা পেশ করে অনেকে দলীল দিতে চেয়েছেন যে, শিক্ষককে দেখে দাড়ানো যায়। কিন্তু আসলে বিষয়টি তেমন নয়। القيام إلى الناس 'আগন্তুককে সম্মান জানানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া' আর القيام للناس 'মানুষের সম্মানে দাড়ানো' এক নয়। রাসূল ﷺ মানুষের সম্মানে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন আর মানুষকে স্বাগতম জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তার দিকে যেতে বলেছেন।

প্রশ্ন (৪১) : ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠানে যেমন. বিয়েতে গায়ে হলুদ, সেমিনার, জন্মদিনের ষ্টেজ, লাইটিং, ইত্যাদি সাজানো বা ডেকোরেশন এর ব্যবসা কি হালাল? এই ব্যবসা করা কি উচিত হবে?

-মুনতাসির মিরাজ
যাত্রবাড়ি, ঢাকা।

উত্তর: যে সকল অনুষ্ঠানে শরীয়তবিরোধী কাজ হয় অথবা অনুষ্ঠানগুলোই শরীয়তসম্মত নয় সেই অনুষ্ঠানগুলো সাজানো বা ডেকোরেশন করাও জায়েয নয়। প্রশ্নে উল্লিখিত গায়ে হলুদ, সেমিনার, জন্মদিনের স্টেজ এগুলো একটিও শরীয়তসম্মত নয়। তাই এগুলো ডেকোরেশনের ব্যবসা করাও জায়েয নয়। কেননা এতে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪২) : শায়খ আমরা জানি যে, জন্মদিন পালন করা হারাম। সেক্ষেত্রে জন্মদিন উপলক্ষে কেক বিজনেস করা কি হালাল হবে?

-মেহেদী হাসান
নাটোর সদর, নাটোর।

উত্তর : জন্মদিন পালন করা বিজাতীয়দের থেকে আসা একটি অপসংস্কৃতি যা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। আর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত' (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১)। সুতরাং জন্মদিন পালন করা জায়েয নয়। আর এই জন্মদিন

পালন করার জন্য কোন সহযোগিতা করাও জায়েয নয়। আর তাই জন্মদিন উপলক্ষে কেকের বিজনেস করাও বৈধ নয়। কেননা এর মাধ্যমে বাতিলকে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪৩) : জনৈক ছেলের এক মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। এখন বিয়ে ঠিক হবে। ছেলেটা যৌতুক নিবে না, কিন্তু মেয়ের বাবা খুশি হয়ে কিছু টাকা দিবেই আর ছেলের বাড়ির সবাই টাকা নিবে। এখন এ টাকা কি নেওয়া যাবে?

-রুবেল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: বিবাহে ছেলের কোন কিছু নেওয়া ইচ্ছা না থাকলেও, মেয়ের পিতা যৌতুক ছাড়াই স্বেচ্ছায় দিতে চাইলেও বর্তমান সমাজে যৌতুকের যে প্রথা রয়েছে তাকে প্রতিহত করার জন্য বিবাহ উপলক্ষে কোন কিছু নেওয়াও যাবে না এবং দেওয়াও যাবে না। কেননা এতে পাপের সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। সাথে সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অর্থ দিয়ে বিবাহ করতে বলেছেন, অর্থ নিয়ে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে তাদের মোহর দিবে' (আন-নিসা, ৪/২৫)। তবে বিবাহের অনুষ্ঠান ছাড়াই জামাই মেয়ের সাংসারিক জীবনকে লক্ষ্য করে কোন সময় মেয়ের পিতা মেয়েকে কোন কিছু দিতে পারে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এক কৃতদাসকে সঙ্গে নিয়ে ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট এলেন, যে কৃতদাসটি তিনি তাকে দান করেছিলেন। ফাতেমা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর পরিধানে এরূপ একটি কাপড় ছিলো যা দিয়ে তিনি মাথা ঢাকলে পা দু'টিতে পৌঁছে না, আর পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে না। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তার এ অবস্থা দেখে বলেন, 'তোমার কোনো পাপ হবে না, কারণ এখানে তো শুধু তোমার পিতা ও তোমার কৃতদাস রয়েছে' (আবূ-দাউদ, হা/৪১০৬, মিশকাত, হা/৩১২০)।

প্রশ্ন (৪৪) : মেয়েরা কি হাতে বা পায়ে আলতা দিতে পারবে?

-ইনসান হাবীব
হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, হাতে বা পায়ে কোন মহিলা আলতা ও নেইল পালিশ দিতে পারবে না। কেননা এটি ইহূদী ও খ্রিষ্টানদের পতিতালয়ের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য (বিস্তারিত দেখুন, বাসর রাতের আদর্শ, আলবানী)। তবে মেয়েদের হাত ও পায়ের নখে মেহেদী বা মেহেদী জাতীয় জিনিসগুলো দেওয়া জরুরী। কেননা একদিন জনৈকা মহিলা হাতে চিঠি নিয়ে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে ইশারা করল। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজের হাতটি গুটিয়ে ফেলে বললেন, 'আমি বুঝতে পারলাম না, এটা কি কোন পুরুষের হাত না কোন মহিলার হাত'? তখন মহিলাটি বললো, এটা মহিলার হাত। তখন তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই মেহেদীর দ্বারা তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে' (আবূ দাউদ, হা/৪১৬৬; মিশকাত, হা/৪৪৬৭)।

প্রশ্ন (৪৫) : আমার বয়স ছাব্বিশ বছর। এখনই আমার চুল পেকে গেছে। আমার একটা প্রশ্ন হলো, আমি কি আমার চুল কালো করতে পারি?

-মো. রুমন ইসলাম
বরিশাল।

উত্তর: না, চুল কালো করা যাবে না। কেননা কালো খেযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বেঁচে থাকো' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১০২, মিশকাত, হা/৪৪২৪)। তিনি আরো বলেছেন, 'শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে যারা কবুতরের বুকের ন্যায় কালো রঙের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' (আবূ দাউদ, হা/৪২১২; নাসাঈ, হা/৫০৭৫; মিশকাত, হা/৪৪৫২)। এমতাবস্থায় মেহেদী দিয়ে খিযাব করবে (তিরমিযী, হা/১৭৫৩)।

প্রশ্ন (৪৬) : মৃত ব্যক্তির নামে ইফতার মাহফিল করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
গাইবান্ধা।

উত্তর : মৃত পিতা-মাতার নামে আমাদের সমাজে যে ইফতার মাহফিলের প্রথা চালু আছে তা শরীয়তসম্মত নয়। মৃত পিতা-মাতার নামে টাকা-পয়সা দান করতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি, তবে কি তিনি নেকি পাবেন? নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪; মিশকাত,

হা/১৯৫০)। তবে কেউ যদি মৃত পিতা-মাতার নামে ইফতারির ব্যবস্থা করতেই চান তাহলে তা করবে অসহায় ফকীর-মিসকীনদের জন্য। কেননা মৃত ব্যক্তির নামে যেটা প্রদান করা হয়, তা ছাদাক্বা। আর ছাদাক্বা সবাই খেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯; মিশকাত, হা/১৭৭২)।

প্রশ্ন (৪৭) : মেয়েরা যখন বাইরে যাবে তখন মাহরামের সাথে যেতে হবে কিন্তু সবার মাহরামরা তো এরকম না। যেসব মেয়েরা পড়াশোনা করে অথবা চাকরি করে তাদের তো বাইরে আসা-যাওয়া করতে হয়। এক্ষেত্রে রিকশায় গেলে রিকশাওয়ালার সাথে একা যাওয়া হলো। যাদের গাড়ি আছে তাদের ড্রাইভারের সাথে যেতে হয়। এক্ষেত্রে মাহরাম পুরুষরা তো সবসময় সাথে যান না আর তাদেরও যার যার কাজ থাকে। এভাবে পড়াশোনা করা ও চাকুরী করা কি জায়েয?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ফরিদপুর।

উত্তর : না। গাড়ি, রিক্সা বা বাইকে এমন কোন পুরুষের সাথে মহিলার একাকিনী যাওয়া বৈধ নয়, যার সাথে কোনও সময় তার বিবাহ বৈধ। বাস, ট্রেন, প্লেন বা জাহাজেও কোনো সফরে যাওয়া বৈধ নয়। এমনকি কোনো ইবাদতের সফরেও নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, এমন নারীর পক্ষে পিতা, সন্তান, স্বামী, ভাই কিংবা মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিণী তিনদিনের দূরত্বে সফর করা বৈধ নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪০; তিরমিযী, হা/১১৬৯)। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'নারী কোন মাহরাম ছাড়া যেন একদিন একরাত সফর না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৮৮; মিশকাত, হা/২৫১৫)। উল্লেখ্য, সাময়িক সময়ের জন্য স্থানীয় কোথাও গেলে যদি ফিতনা থেকে মুক্ত হয় এবং অন্য কোন সাবালক ছেলে, পুরুষ বা মহিলা থাকে, তাহলে যাওয়া চলে। কিন্তু সফর হলে সঙ্গে মাহরাম ছাড়া মোটেই যাওয়া বৈধ নয়; যদিও সাথে অন্য মহিলা বা পুরুষ থাকে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১৭/৩৩৬)।

প্রশ্ন (৪৮) : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণত বিদায় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এটি কি শরীয়তসম্মত?

-সালমা, ঢাকা।

উত্তর : ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ ও পথনির্দেশনা দেওয়া এবং মন্দ কর্ম হতে সতর্ক করার জন্য বিদায় অনুষ্ঠান করাতে কোন বাধা নেই। তবে অনুষ্ঠানটি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে এবং শরীয়ত বহির্ভূত সকল কাজ হতে মুক্ত থাকতে হবে। রাসূল ﷺ কোন সৈন্যদল অথবা কোন মেহমানকে বিদায় দানকালে উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন (তিরমিযী, হা/৩৪৪৪; আবূ দাঊদ, হা/২৬০১; মিশকাত, হা/২৪৩৫-৩৭)। পক্ষান্তরে এসব অনুষ্ঠানে যদি নাচ-গান, ছাত্র-ছাত্রীদের মালাপ্রদান, ছবি তোলাসহ আরো বিভিন্ন প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হয়ে থাকে, তাহলে তাতে যোগদান করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

মীরাছ বণ্টন

প্রশ্ন (৪৯) : আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ। আমার দুই ছেলে আছে। কিন্তু বড় ছেলে আমার কোনো খরচ বহন করে না এমনকি আমার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার যাবতীয় খরচ আমার ছোট ছেলে বহন করে থাকে। এখন আমি আমার সম্পত্তি থেকে ছোট ছেলেকে কি বেশি দিতে পারবো?

-আলী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : না, এক সন্তানকে অন্য সন্তানের থেকে বেশি দেওয়া যাবে না। সন্তানদেরকে দেওয়ার সময় পিতা-মাতার জন্য ইনছাফ করা আবশ্যক। কোন সন্তানকে বেশি দেওয়া, আর অন্য সন্তানকে কম দেওয়া পিতা মাতার জন্য বৈধ নয়। নুমান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বিনতু রাওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আমার পিতার নিকট আমার জন্যে তার সম্পদ থেকে কিছু দান করার অনুরোধ করলেন। এক বছর যাবৎ তিনি এ ব্যাপারে গড়িমসি করেন। পরে তা দেয়ার ইচ্ছা জাগলো। বিনতু রাওয়াহা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, আমার পুত্রকে যা দিবেন তার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি খুশি হবো না। তখন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। সে সময় আমি বালক ছিলাম। তিনি বললেন, হে

আল্লাহর রসূল! এর মা বিনতু রাওয়াহা চায় যে, আমি তাঁর পুত্রকে যা দান করেছি তাতে আপনাকে সাক্ষী রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বাশীর! এ ছাড়া তোমার কি আর কোন পুত্র আছে? বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি তাদের সকলকে এরূপ দান করেছো? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমাকে সাক্ষী রেখো না। কারণ, আমি যুলুমের ব্যাপারে সাক্ষী হই না (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)। অন্য বর্ণনাতে আছে, রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ন্যায় বিচার করো। তখন আমার পিতা চলে আসেন এবং সে দান ফিরিয়ে নেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৭৮)।

প্রার্থনা

প্রশ্ন (৫০) : হাদীছের মাধ্যমে আমরা জানি যে, শেষরাতে মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তখন কি আমি ওযূ এবং ছালাত আদায় করা ছাড়াই ঘুম থেকে উঠে মহান আল্লাহর নিকট দো'আ করতে পারবো?

-রাসেল মাহমুদ
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : হ্যাঁ, শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে ওযূ ও ছালাত আদায় করা ছাড়াই আল্লাহর নিকট দো'আ করা যাবে। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার মাইমুনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘরে রাত কাটালাম। তখন নবী ﷺ তাঁর কাছে ছিলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছালাত কেমন হয় তা দেখার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় কথা বললেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা শেষের কিছু অংশ বাকী থাকল, তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে.....বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য- (আলে ইমরান ৩/১৯০)। তারপর তিনি উঠে গিয়ে ওযূ ও মিসওয়াক করলেন। অতঃপর এগারো রাকা'আত ছালাত আদায় করলেন। বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু (ফজরের) ছালাতের আযান দিলে তিনি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে ছাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৫২)।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ছোটদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট
মূল্য: ১০০০ টাকা
সাইজ: ৭.৭৫*৮.৭৫"

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। গল্পে গল্পে সোনামণিরা এবার জেনে যাবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বর্ণাঢ্য জীবনী, যারা ছিলেন এই উম্মাহর সেরাদের সেরা।

'আমার প্রথম পাঠাগার' সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট
মূল্য: ৯০০ টাকা
সাইজ: ৩.৫*৪"

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন অ আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে জয়েন করুন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ কিতাবিয়ান-এ!
লিংক- https://www.facebook.com/groups/kitabiyan

sondiponbd
www.sondipon.com
sondiponprokashon@gmail.com
01779 19 64 19 ,01406 300 100
34, Madrasa Market (1st Floor), Banglabazar

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

Monthly Al-Itisam الاعتصام 6th Year, 7th Part, May 2022, Price : 25.00

BONOJO

Organic BONOJO ™

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা

অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন
bonojobd

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

ঈদ অফার ২০%

ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে
তুবা পাবলিকেশনের সকল বইয়ে বিশেষ ছাড়
৫ এপ্রিল ২০২২ থেকে ২০ মে ২০২২

তুবা পাবলিকেশনের সকল বই
২০% ছাড়
সাথে থাকছে একটি মাসিক আল-ইতিছাম পত্রিকা

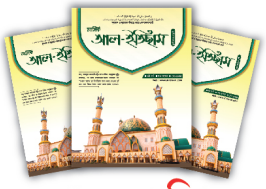

একদম ফ্রি

৪০০০ টাকার বই অর্ডার করলেই
ডেলিভারি চার্জ ফ্রি

তুবা পাবলিকেশনের ২৬ টি বইয়ে পূর্বের মূল্য ২৯২৫ টাকা। ২০% ছাড়ে সেই বই পাচ্ছেন ২৩৪০ টাকায়।

যোগাযোগ : রাজশাহী শাখা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬ | ঢাকা শাখা : ০১৪০৭-০২১৮৫০